আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৬৩

৪র্থ প্রকাশ

রজব	১৪২৯
শ্রাবণ	১৪১৫
জুলাই	২০০৮

বিনিময় ঃ ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ADHUNIK JUGE ISLAMEE BEPLOB by Muhammad Kamaruzzaman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 80.00 Only.

সূচীপত্র

লেখকের কথা

আধুনিক যুগটাকে অনেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞানের অসাধারণ শক্তিশালী ও বিস্ময়কর আবিষ্কার বস্তুগতভাবে মানবজাতিকে ভোগ-বিলাস; আরাম-আয়েশের অনেক কিছুই দিয়েছে। বলা হচ্ছে, সভ্যতা উন্নতির এক চরম শিখরে আরোহণ করেছে। পৃথিবীটা এখন মানুষের মুঠোর মধ্যে ; যদিও সৃষ্টিজগতের অনেক রহস্যই মানব সন্তানের পক্ষে এখনও উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে মানবজাতি অনেক কিছু লাভ করা সত্ত্বেও একটি অভাব বোধ মানুষকে তাড়িয়ে ফিরছে।

মানুষের সত্যিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মানুষে মানুষে বৈষম্য, বঞ্চনা, মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে হানাহানি সংঘাত-সংঘর্ষ মানুষের শান্তি স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। যুদ্ধোন্মাদনা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, পারমাণবিক শক্তি মানব সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলেছে। কেউ বলছেন, বিশ্বের গোটা মানব সমাজ আজ এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। কেউ বলছেন, এটা মানব জাতির এক ক্রান্তিকাল। কেউ বলছেন, বর্তমান সময়টা বড় দুঃসময়। অনেকের মন্তব্য, এটি একটি কালো সময়। এসব মন্তব্যের মধ্য দিয়ে মূলতঃ বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে মানুষের এক ধরনের হতাশাবাদই ব্যক্ত হয়েছে। মানুষ এ অবস্থাটা উত্তরণ করতে চায়। অর্থাৎ এর একটি বিকল্প মানব জাতির কাম্য। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এ বিপন্ন অবস্থার হাত থেকে মানুষ বাঁচার জন্য আজ পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নেই মানব গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পৌনে এক শতাব্দী কাল যাবত কমিউনিজমের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আবার মানুষের মোহভঙ্গ হলো। ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের যতসব সোনালী স্বপ্ন। কমিউনিস্ট ব্যবস্থাপনার অন্তঃসারশূন্যতা নব্বই-এর দশকের ঊষালগ্নে নিয়ে এলো পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের বিপ্লব। কমিউনিস্ট বিপ্লবের হাতছানিতে আন্দোলিত মানবগোষ্ঠী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করলো কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রকে। গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বব্যাপী গণজাগরণকে কমিউনিস্টরা পর্যন্ত লুফে নিয়েছে। গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া ব্যবস্থা বলে গালি দেয়া ছাড়া যারা কিছুই বুঝতো না তারাই

আজ গণতন্ত্রগত প্রাণ। এটি যে তাদের প্রতারণার এক নতুন কৌশল বৈ আর কিছু নয় তা কি বলার অপেক্ষা রাখে ? একথা কারো বুঝতে বাকী নেই যে, রাতারাতি তাদের গণতন্ত্রী সাজা একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। গণতন্ত্রকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই যে ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল সেই ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সাথে কিভাবে খাপ খাওয়াবে সে প্রশ্ন মোটেই অবান্তর নয়। একশ' বছরের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণিত হলেও অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজে অবাধ পুঁজিবাদের বিকাশের কারণেই শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মানবতা মুক্তি পায়নি। শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির বিকাশ নিশ্চিত করা যায়নি। উপরন্তু ধনী ও গরীবের বৈষম্য হ্রাস পায়নি। ফলে বিংশ শতকের প্রথমভাগেই হতাশাগ্রস্ত মানব সমাজের এক বিরাট অংশ সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব পৌনে এক শতাব্দীতে মানবজাতিকে তেমন কিছুই দিতে পারেনি। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। পশ্চিমা গণতন্ত্র মানুষের জীবনে যে অর্থনৈতিক ও বস্তুগত সমৃদ্ধি দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি। অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। অবাধ পুঁজিবাদকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী সমাজ ভোগবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতার উর্ধে উঠতে পারেনি। মানুষের সত্যিকার মর্যাদা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারেনি। এহেন এক পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের পতনের মাধ্যমে বিশ্বময় আবার গণতন্ত্রের যে জাগরণের সূচনা হয়েছে তা কি সত্যিকার অর্থে মানব জাতির মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারবে ? পশ্চিমা গণতন্ত্র তো এক পরীক্ষিত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা নতুন করে বিশ্ববাসীকে আর কি দিবার শক্তি রাখে ? পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এ দুই প্রান্তিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার প্রয়োজন মানবজাতির জন্য। ইসলামই হচ্ছে সেই ভারসাম্যপূর্ণ বিধান যা মানবজাতির শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। তত্ত্বগতভাবে একথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আজকের যুগের প্রয়োজন হলো তাত্ত্বিক বক্তব্যের পরিবর্তে কিভাবে ইসলামী ব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার পদক্ষেপ গ্রহণ। কি করে ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা যেতে পারে তাই আজ বিবেচনার বিষয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি ইসলাম কিভাবে অর্জন করতে পারে সেটাই এখন মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত। ইসলামের তত্ত্বগত শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনার চাইতে ইসলামের

বাস্তবায়ন; রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তবায়নের আলোচনা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং ইসলামের রাষ্ট্র বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হতে পারে নিঃসন্দেহে এটিই হওয়া উচিত ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়। ইসলামী ব্যবস্থায় উত্তরণ কিভাবে সম্ভব, বর্তমান ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে কিভাবে ইসলামের খেলাফতি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় ; এর পথ ও পন্থা কি এ নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিভিন্ন ধারণা আছে বা থাকাটাই স্বাভাবিক। কারও হয়তো স্পষ্ট ধারণা আছে। আবার কেউ হয়তো এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা খুব একটা করেন না। তবে কিভাবে এ লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব তা নিয়ে অস্থিরতা যে নেই তা বলা যায় না। ইসলামী আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর সন্তোষ ও রেজামন্দি হাসিল। আর দুনিয়াবী জীবনে ইসলামকে বিজয়ী করার কথা তো আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। দুনিয়ায় সকল মতবাদ, ব্যবস্থার উপর আল্লাহর দেয়া বিধান ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে। আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-এর মিশন ছিল তাই।

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ (الصف ٦١ : ٩)

"তিনিই তাঁর রাসূলকে (সা) প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।"-(সূরা আস্ সাফ ঃ ৯)

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○ (الفتح ٤٨ : ٢٨)

"তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন অপর সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"-(সূরা ফাত্হ ঃ ২৮)

আল্লাহর দ্বীনকে অন্যসব ব্যবস্থার উপর জয়যুক্ত করতে হলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য। এ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন আনতে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবে তাকেই বিপ্লব বলা যেতে পারে। মোদ্দাকথা এই যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের দেশ পরিচালনার দায়দায়িত্ব গ্রহণ

করতে হবে। এ দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারটা কিভাবে হবে ? স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কাজ করে জনগণের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করে জনগণের ইচ্ছায় ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। অন্য কোন পন্থায় সম্ভব নয়। নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক কিংবা গণজাগরণের মাধ্যমেই হোক জনগণের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয়।

এ গ্রন্থে ইসলামী বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, পূর্বশর্ত, স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সংগঠন নেতৃত্বসহ বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব, বিপ্লব সাধনের পথ, তাছাড়া সশস্ত্র সংগ্রাম, সামরিক শাসন, গণঅভ্যুত্থান ও নির্বাচন এসব পন্থার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি সঠিক ইত্যাদি নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। বিপ্লবের প্রক্রিয়া সম্পর্কেই সাধারণত বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে, মতপার্থক্যের কারণ ঘটে প্রক্রিয়া নিয়েই। যেহেতু ইসলামী বিপ্লব পর্দার অন্তরালের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়, কিংবা আঁতাত ও ষড়যন্ত্র ঘৃণা করে এবং যেহেতু মানুষের মুক্তি ও কল্যাণই এর লক্ষ্য, যে জনপদে বিপ্লব সংঘটিত হবে সেই জনপদের জনমণ্ডলীকে ঐ বিপ্লবের জন্য ত্যাগ ও কোরবানী স্বীকার করতে হবে এবং যেহেতু ঐ জনপদের জনগোষ্ঠীর সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে সেহেতু এ বিপ্লব গোপন কৌশলের ব্যাপার নয় বরং খোলামেলা ও প্রকাশ্য কৌশল। সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে বিভিন্ন দেশের কৌশল গৃহীত হবে। তবে সাধারণ কিছু বিষয় আছে যা সর্বত্রই প্রযোজ্য বলে ধরে নেয়া যায়। এ গ্রন্থে একটি সাধারণ আলোচনাই করার চেষ্টা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে কিছু বিশেষ দিক সংযোজিত হয়েছে। খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা নেয়া সম্ভব হতে পারে। গ্রন্থটি পাঠ করে সম্মানিত পাঠকবর্গ যদি দয়া করে ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করেন কিংবা পরামর্শ বা কোন বক্তব্য এ লেখককে জানান তাহলে তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হবে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইসলামী আন্দোলনের সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সাহচর্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার লেখার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। এ দীর্ঘ সময়ে এ আন্দোলনের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও কর্মীদের সংস্পর্শে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের অগ্রগতি, সমস্যা, সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করার কিংবা সে সম্পর্কে অন্যভাবে জানারও সুযোগ আমার হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের মূল্যবান গ্রন্থাদির সহযোগিতা তো আছেই। দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত যুব মানসের সাথে পরিচিত

হবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। এ সবের পাশাপাশি ইসলামী বিপ্লবের রংয়ে পৃথিবীকে রাঙিয়ে দেয়ার যে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে বিদ্যমান তার কারণেই সম্ভবতঃ আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হতে পারে এমন একটি অতীব জটিল বিষয়ে লিখার সাহস পেয়েছি। অন্যথায় এমন একটি অতীব জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে কোন কিছু লেখার বা মন্তব্য করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই। আমার এ লেখা থেকে যদি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সামান্যও উপকৃত হন তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন। এ লেখাটি তৈরী ও বই হিসাবে তা প্রকাশের ব্যাপারে নানাভাবে যারা আমাকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা যথাযোগ্য পুরস্কৃত করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

ঢাকা, ১৭-১২-৯০ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

১. আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ

বিশ্ব মানবতা আজ এক মহা সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য এবং জুলুম, পারমাণবিক রণসজ্জা এবং বিবেকহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশ্ববাসীকে অশান্তির অনলে নিক্ষেপ করেছে। বিপথগামী মানুষের মুক্তির জন্য যুগে যুগে এ বিশ্বজাহানের মহান স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন নবী-রসূল ও আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)। তাঁরা মানব জাতির শান্তি ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। মানবতাকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ প্রেরিত ঐসব মহা মনীষীগণ দুনিয়াতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংগ্রাম চালিয়েছেন। মানব জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

সর্বকালের, সর্বযুগের সকল মানুষের মুক্তিদূত, মানবতার মহান বন্ধু ও শিক্ষক রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐসব মহাপুরুষদের সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব, আখেরী নবী। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সমাজে আবির্ভূত হয়ে তিনি বিশ্ব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় বিপ্লব সাধন করে প্রতিষ্ঠা করেন শান্তির সমাজ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার অনুকরণে গড়ে উঠে 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত' বা নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা। বত্রিশ বছরকাল এই ইসলামী খেলাফত সঠিক পদ্ধতির উপর কায়েম ছিলো।

হযরত হুসাইন (রা)-এর কারবালার প্রান্তরে মর্মান্তিক শাহাদাতের মধ্য দিয়েই সূচনা হয় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের। পরবর্তী সময়ে ইসলামী ব্যবস্থাকে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চলেছে এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। এজন্য প্রতি শতাব্দীতেই আবির্ভাব হয়েছে অসম সাহসী, স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী, গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত মুজাদ্দিদের। এই মুজাদ্দিদগণ নিজের পরিবেশ, সমসাময়িক জটিলতা, যুগের বিকৃত গতিধারা, ভ্রান্ত চিন্তার বিরুদ্ধে জেহাদ করার ক্ষমতা ও সাহস, নেতৃত্বের জন্মগত যোগ্যতা এবং ইজতিহাদ ও পুনর্গঠনের অসাধারণ ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যে ছিলেন সমুজ্জ্বল। পরিবেশ-পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন, সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি, ইসলামী নেতৃত্বদানের মতো লোক তৈরী, দ্বীন ইসলামের

গবেষণা-ইজতিহাদ, ইসলামের প্রসার ও বিকাশ তথা বিশ্বজনীন বিপ্লব সৃষ্টির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে তাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন।

ইসলামী পুনর্জাগরণের এ সংগ্রামে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) (৬১-১০১ হিজরী), ইমাম আবু হানিফা (র) (৮০-১৫০ হিজরী), ইমাম মালেক (র) (৯৫-১৭৯ হিজরী) ইমাম শাফেয়ী (র) (১৫০-২৪০ হিজরী), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) (১৬৪-২৪১ হিজরী), ইমাম গাজ্জালী (র) (৪৫০-৫০৫ হিজরী), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) (৬৬১-৭২৮ হিজরী), শায়খ আহমদ সরহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) (৯৭৫-১০৩৪ হিজরী), শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) (১১১৪-১১৭৬ হিজরী), সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) (১২০১-১২৪৬ হিজরী) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) (১১৯৬-১২৪৬ হিজরী), এবং শাহ আবদুল আজিজ (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা যে জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইসলামী পুনর্জাগরণের এ ধারা ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় আজও অব্যাহত রয়েছে। সমস্যা সংক্ষুব্ধ আজকের পৃথিবীর দেশে দেশে চলছে এ পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টা। পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট বিশ্ব মানবতা ছুটে চলেছে আজ শান্তির অন্বেষায়। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন মানুষের তৈরী পুঁজিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটবে এবং অবসান ঘটবে বিশ্বময় জুলুম, শোষণ, নির্যাতন এবং নিপীড়নের। আবার দুনিয়াময় কায়েম হবে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াত' অর্থাৎ নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত। নবী করীম (সা) এ সম্পর্কে হাদীসে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ প্রসঙ্গে শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) তাঁর 'মানসাবে ইমামত' গ্রন্থে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

ان اول دينكم نبوة ورحمة و تكون فيكم ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله جل جلاله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله جل جلاله ـ

ثم تكون ملكا عاضافيكون ماشاء الله ان يكون ثم يرفعه الله جل جلاله ـ

ثم تكون ملكا جبرية فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله جل جلاله ـ

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل فى الناس بسنة النبى ويلقى الاسلام بجرانه فى الارض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الارض لاتدع السماء من قطر الاصبته مدرارا ولا تدع الارض من نباتها وبركاتها شيئا الا اخرجته۔

"তোমাদের দ্বীন এর আরম্ভ নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ চান। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নুবয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে যতদিন আল্লাহ্ চান। অতপর আল্লাহ্ তাও উঠিয়ে নেবেন।

তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারপর আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাও উঠিয়ে নেবেন।

অতঃপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাও উঠিয়ে নেবেন।

অতঃপর আবার নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নাত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী সবাই খুশী থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বণ্টন করবে এবং পৃথিবী তার পেটের সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদগীরণ করে দেবে।"–(তিরমিযি)

এ হাদীসে ইতিহাসের পাঁচটি পর্যায়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং চতুর্থ পর্যায়টি বর্তমানে চলছে। শেষে যে পঞ্চম পর্যায়টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সমস্ত আলামত একথা ঘোষণা করছে যে, মানুষের ইতিহাস দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের গড়া সকল মতবাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং তা ভীষণভাবে ব্যর্থও হয়েছে। বর্তমানে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।[১] সাইয়েদ কুতুব শহীদ এ সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যৎকাল এ ধর্মের জন্য নির্ধারিত। এ ধর্মীয় ব্যবস্থার সুউচ্চ ও মহান পরিকল্পনা এবং এমন একটা ব্যবস্থার জন্য মানবজাতির স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামই হচ্ছে আগামী সভ্যতার ধর্ম। এক

১—

নজীরবিহীন ভূমিকা পালনের জন্য সে আহূত হবে। কেননা ইসলামের শত্রুরা স্বীকার করুক আর নাই করুক এ ভূমিকা অপর কোন ধর্ম বা মতবাদ দ্বারা পালিত হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি, গোটা মানবজাতি আর অধিক কাল এ ধর্মকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না। আত্মরক্ষার মহা তাগিদেই মানুষ একে গ্রহণ করবে।

আজকের মানুষের জন্য ইসলামের প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের মানুষের জীবনে ইসলামের প্রয়োজনের মতোই তীব্র। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এমনি এক পরিস্থিতিতে অতীতে যা ঘটেছে আজকে বা আগামীতেও তাই ঘটবে। বস্তুবাদী সভ্যতার প্রসার ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর জুলুম-নির্যাতন চলা সত্ত্বেও আমাদের মনে যেন সংশয়বাদ সামান্যতম রেখাপাত না করতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য অন্যায় ও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এটা সত্য মহাগ্রন্থ আল কোরআনের অবমাননা করা হচ্ছে। কিন্তু সত্যের শক্তি ইসলামের পক্ষে। সব প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার চড়াই উতরাই পেরিয়ে কালজয়ী হবার সামর্থ আছে ইসলামের।

আমরা একা নই। প্রকৃতি আমাদের পক্ষে। অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতি মহাশক্তিধর এ শক্তি সভ্যতার অপরাপর শক্তির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে তখন সংঘর্ষকাল যত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হোক না কেন প্রকৃতি বিজয়লাভ করে।[২]

❒

২. বর্তমান প্রেক্ষাপট

ইসলামী বিপ্লব, ইসলামী শাসন, ইসলামী সমাজ, শরীয়তের শাসন, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামীকরণ, ইসলামী আন্দোলন এসব পরিভাষা আজকের বিশ্বে বেশ পরিচিত ও আলোচিত একথা বললে বোধহয় অতিশয়োক্তি হবে না। প্রায় অর্ধ শতাধিক মুসলিম দেশ ছাড়া অন্যত্রও এসবের চর্চা তুলনামূলকভাবে বেড়েই চলেছে। আধুনিকীকরণের মত ইসলামীকরণ বা প্রগতিবাদীর মত মৌলবাদী শব্দগুলোও পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যমসমূহ অহরহ ব্যবহার করছে। সবকিছুর মধ্য দিয়েই একটি সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে বিশ্লেষণ করার অনেক যুক্তিসংগত ভিত্তি রয়েছে। আর ঐ সত্যটি হলো ইসলাম একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ধর্ম, জীবন দর্শন, যা নাস্তিক্যবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক শাসন শোষণ ও ত্রাসনেও তার শক্তি এবং কার্যকারিতা হারায়নি। বরং মানব জীবনের জন্য, বিশ্ব মানবতার সত্যিকার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ইসলামই আধুনিকতম প্রগতিশালী এবং অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন জীবন ব্যবস্থা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছে ততই মানব রচিত ব্যবস্থার অন্তসারশূন্যতা, দুর্বলতা, অবাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানব সভ্যতার হেফাজত এবং বিকাশের জন্য ইসলামের শাশ্বত এবং চিরন্তন মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তাই যেন তীব্রতর হচ্ছে।

পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা, ধর্মনিরপেক্ষতা, অবাধ পুঁজিবাদ, স্রেবাসী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রেও জাতীয়তাবাদের জয়-জয়কার এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের মোড়লিপনার এ স্বর্ণযুগে উল্লেখিত মন্তব্য অসংলগ্ন চিন্তার প্রকাশ বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন বা যে ভাষাই ব্যবহার করা হোক না কেন আজকের দুনিয়ায় ইসলাম একটি বাস্তবতারই নাম।

সর্বশেষ অবতীর্ণ জীবন বিধান ইসলাম এমনই এক মূল্যবোধ ও জীবন ব্যবস্থার প্রবক্তা যার আধ্যাত্মিক এবং যুক্তিভিত্তিক শক্তি সামর্থের মুকাবিলায় দুনিয়ায় আর কোন দ্বিতীয় ব্যবস্থা নেই।

নাম উল্লেখ না করেও বলা চলে বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ছাড়া যে কয়টি ধর্ম প্রধান বলে বিবেচিত ওসবের ভিত্তিও খুব দুর্বল কিংবা ইসলামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত ক্ষমতা সম্পন্ন নয়।

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজতন্ত্র যে ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে সেটাও তার কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারেনি। এমন কি এক সময়

সমাজতন্ত্রকে যতটা ভয় পুঁজিবাদ করতো সেই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদও সমাজ তন্ত্রকে আর আদর্শিক চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে না।

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে একের পর এক বিপর্যয় নেমে এসেছে। লৌহ প্রাচীরের অন্তরাল থেকে বের হয়ে এসেছে জনগণ। জনতার রুদ্ররোষে ধস নেমেছে ঐসব দেশের সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলোর। সমাজতন্ত্র সেখানকার জনগণই প্রত্যাখ্যান করছে। প্রত্যাখ্যান করছে দীর্ঘদিনের কম্যুনিষ্ট শাসন। সুচতুর মিঃ গর্বাচেভ পেরেস্ত্রয়কা ও গ্লাসনষ্টের নীতি ঘোষণা করে সমাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। কার্লমার্ক্সের চিন্তাধারা পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানা ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ আইন সিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভিন্নমতের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। অকম্যুনিষ্টদের নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। অস্ত্র সীমিতকরণসহ বৈদেশিক নীতিতেও পরিবর্তন আনয়নের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। এখন পালা চলছে ইউরোপ থেকে সোভিয়েত ও মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করার। তৃতীয় বিশ্বে দুই পরাশক্তির তথাকথিত স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। এক পক্ষে মার্কিন অপর পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মেরুকরণ পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। নতুন বিশ্ব রাজনীতি আরেকটি নতুন মেরুকরণের দিকে এগিয়ে চলছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে বার্লিন প্রাচীর এবং দুই জার্মানী এখন ঐক্যবদ্ধ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। আপাতঃ দৃষ্টিতে পশ্চিমা পুঁজিবাদের সর্দার যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তসারশূন্যতাও তো বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে। সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের ফলে কার্যতঃ দুনিয়াতে একদিকে পুঁজিবাদ ও অন্যদিকে অবস্থান করছে ইসলামী ব্যবস্থা। সোভিয়েত মার্কিন ঐক্যের মাধ্যমে একটা নতুন পরিস্থিতি অত্যাসন্ন। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের লৌহযবনিকার অন্তরালের জনগণ ধর্ম, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে আওয়াজ তুলেছে, ক্ষয়িষ্ণু এবং পরীক্ষিত পশ্চিমা পুঁজিবাদ তা মিটাতে পারবে বলে আশাবাদ পোষণ করা একেবারেই অর্থহীন। মানুষের প্রকৃতির ধর্মের প্রতি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রায় অভিন্ন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানবতা সমাজতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে আবারও পুরনো পুঁজিবাদ গ্রহণ করে এগিয়ে যাবে তা আশা করা আদৌ সমীচীন নয়। বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর জনগণ মার্ক্সবাদের পতনের পর ইসলামকেই

বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এ আলামত আজ সুস্পষ্ট। অথচ মার্ক্স-লেলিন-ষ্ট্যালিনরা মানুষের জীবন থেকে ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য চালিয়েছিলেন নারকীয় অনেক অভিযান। ইসলামের প্রভাব মুছে ফেলার জন্য সর্বপ্রকার নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলামকে ঐসব অঞ্চলের জনগণের হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। সামান্য ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের পর তারা যে উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে এটা সুস্পষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসরত ৭/৮ কোটি মুসলমানের জীবনে ইসলামের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত আছে।

সম্প্রতি টাইমস সাময়িকীতেও এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, মানুষের জীবন থেকে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার যে নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নে দীর্ঘদিন অনুসৃত হয়েছে তা খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরোধী মনোভাবের সাথে সাথে সেখানকার জনগণের ধর্মীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে। আজারবাইজানের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে ইসলামী চেতনার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। মধ্য এশীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্রসমূহে যে সাহসী ইসলামী তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাতে উদ্বিগ্ন। সংস্কারের প্রবক্তা মিঃ গর্বাচেভ নিজে মাত্র চার বছর আগেও ইসলামকে 'প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের শত্রু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আজারবাইজানে সোভিয়েত সহিংসতায় নিহত মুসলমানদের জানাজায় প্রায় ১৫ লাখ লোকের সমাগম হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐসব অঞ্চলে ইসলামী জাগরণ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। এমতাবস্থায় দুই বিশ্ব শক্তির ভূমিকা ইসলামের বিপরীত মেরুতে অবস্থান নেয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং আজকের দুনিয়ায় সুপার পাওয়ারের দ্বন্দ্ব কোন আদর্শিক দ্বন্দ্ব নয়। এ দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। ঐ পতনোন্মুখ দু'টো মতাদর্শই সমানভাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। যেহেতু জীবন ও জগত সম্পর্কে প্রায় অভিন্ন ধারণা পেশ করেছে সেহেতু অর্থনৈতিক প্রশ্নে ভিন্নমুখী কাঠামোর প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের দৃষ্টিতে ঐ দু'টি মানব রচিত মতাদর্শের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'টি মতাদর্শই মানবতার কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই করেছে। তাছাড়া ঐ দুই মতাদর্শ ও নেতৃত্বদানকারী দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির টানাপোড়েনে বিশ্ব আজ অশান্তি ও জুলুমের অগ্নি গহ্বরে নিমজ্জিত। ওরা বিশ্বকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটি ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে।

যুগে যুগে মুক্তিকামী মানবতা যেমন মুক্তির জন্য লড়াই করেছে, সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছে ইসলামের ইতিহাসের মহামনীষী এবং মহানায়কদের নেতৃত্বে ; তেমনি আজ অব্যাহত আছে সেই সংগ্রাম এবং আন্দোলন।

ইসলামকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তথা বিজয়ী শক্তি হিসেবে পরিগণিত করার এ সংঘবদ্ধ প্রয়াস পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে।

ইসলামী পুনর্জাগরণের এ প্রচেষ্টা নানা প্রতিবন্ধকতা কিংবা অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দিন দিন অগ্রগতিই লাভ করছে। চরমপন্থী, মৌলবাদী, ফ্যানাটিক, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করে কোথাও কোথাও অবতীর্ণ জীবন বিধানের আলোকে পরিচালিত মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত মহান ইসলামী আন্দোলনকে হেয় করার কিংবা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশল অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের ভূমিকা অনবদ্য হয়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি কায়েমী স্বার্থ পূঁজারী এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিত্তবান, অবৈধ সম্পদের অধিকারী ও ধর্মের নামে প্রবঞ্চনাকারী ক্ষমতালিপ্সু গোষ্ঠী সর্বাবস্থায় ইসলামী পুনর্জাগরণ বা ইসলামী আন্দোলনের বিকাশ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সমানভাবে প্রস্তুত। উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসলামের পুনরাবির্ভাবে শংকিত বলে ওরা দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনসমূহ খতম করে দেয়ার জন্যে মদদ যোগায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের অগ্রাভিযান থেমে নেই।

❑

৩. দেশে দেশে জন আকাঙ্ক্ষা ঃ ইসলামী বিপ্লব

আজকের বিশ্বে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এমন একটা সময় আসছে যখন বিভিন্ন দেশ তার শিক্ষা, অর্থ, বিচার ব্যবস্থা এক কথায় জীবনের সব সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই করতে চায়। আর এজন্যই একটি ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে দেশে দেশে। এর সবচাইতে বড় প্রমাণ হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলো।

বর্তমান দুনিয়ায় সবচাইতে পরিচিত দু'টো আন্দোলনের নাম জামায়াতে ইসলামী এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুন। এছাড়াও তুরস্কে মিল্লি সালামত পার্টি বা ন্যাশনাল সলভেশন পার্টি, ফজিলত পার্টি বর্তমানে জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপম্যান্ট পার্টি, মালয়েশিয়ায় ইসলামিক পার্টি অব মালয়েশিয়া, ইয়েমেনে আল ইসলাহ্ পার্টি, ওলামা ও মোহাম্মদীসহ কতিপয় ইসলামী দল এবং মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংগঠনও ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই করে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে প্রায় ৩০টি ছাত্র সংগঠন এবং ১২০টির মত ছাত্র যুব সংগঠন এই প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট। এশিয়া, আফ্রিকার সকল আরব দেশে ইখওয়ান বা অনুরূপ সংগঠন এবং উপমহাদেশের সকল দেশে জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতা রয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ইসলামী সেন্টার, মসজিদ ও ইসলাম চর্চা কেন্দ্র।

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইসলামের জোয়ার কতটা প্রবাহিত হয়েছে বা কতটা গভীরভাবে বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে তা পর্যালোচনা সাপেক্ষ হলেও মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলন বা ইসলামী শক্তির উত্থানের আলামত স্পষ্ট। ব্যাপক আন্দোলন হিসেবে হোক, আংশিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে হোক, ইস্যুভিত্তিক বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে হোক মুসলিম দেশসমূহের সরকারগুলো আর আগের মত ইসলামের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে পারছে না। আমাদের জানা মতে আভ্যন্তরীণভাবে প্রতিটি মুসলিম দেশের এমন কি কতিপয় অমুসলিম দেশেও (যেখানে মুসলিম সংখ্যা উল্লেখযোগ্য) সরকারসমূহ ইসলামের অনুসারীদের পক্ষ থেকে এক ধরনের রাজনৈতিক চাপ অনুভব করছে। অবশ্য অনেক মুসলিম দেশ ইসলামী জাগরণে শংকিত এবং তারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এটা অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক যে, অনেক মুসলিম দেশে

রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত নয়। কোন কোন দেশে নির্যাতন ও নিপীড়নের ফলে কিছু কিছু লোক বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন চললেও যেসব জায়গায় মুসলমানদের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি জড়িয়ে গিয়েছে সেসব জায়গায় আন্দোলন জংগী রূপ নিয়েছে। যেমন ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ফিলিপাইন প্রভৃতি স্থানে মুসলমানরা জংগী তৎপরতায় নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। এসবের সাথে সাধারণভাবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ান যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তার তুলনা করা বা এক করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে ইসলামের অনুসারীদের সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকাকে মৌলবাদী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করলেও লক্ষণীয় যে উল্লেখযোগ্য বেশ ক'টি রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক আন্দোলন সাম্প্রতিককালে বেশ গতি লাভ করেছে এবং শক্তি সঞ্চার করেছে।

কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক খোলাফায়ে রাশেদার অনুকরণে একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে বসবাস করার আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি দেশের মুসলিম জনতার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। বৃহত্তর মুসলিম জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাকে। দেশে দেশে ইসলামী বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা আজ জন আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ ১৪৫ মিলিয়ন বাংলাদেশে বসবাস করে। বাংলা ভাষা বিশ্বের ৬ষ্ঠ বৃহৎ ভাষা। বাংলাদেশের শতকরা একশত ভাগ লোক একই ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চালু রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। উর্বর জমি ও পরিশ্রমী মানুষ আছে। দেশটি খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর, মাথাপিছু আয় বাড়ছে, গড় আয়ু বাড়ছে, শিক্ষার হার বাড়ছে, মা ও শিশুর মৃত্যু হার কমছে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেশটি এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বদ্বীপ বাংলাদেশে ইসলামী শাসনের অধীনে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা এখানকার জনগণের দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা। এজন্যে তারা বার বার নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশক থেকে এ

যাবত প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনে এই জন আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, জনগণের মনের কোণে লালিত এ পবিত্র আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি আজও। তবে এ পথে দেশ যে খানিকটা এগিয়েছে এবং জনগণের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংগ্রাম অনেকটা সংঘবদ্ধ হতে যাচ্ছে একথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করা চলে।

কিন্তু ইসলামের ভিত্তিতে একটি ইসলামী বিপ্লব কি, বিপ্লব বা পরিবর্তনের যে প্রশ্নটি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূল জিনিস সে বিপ্লবের অর্থ কি অথবা সে পরিবর্তন মানে কি তা আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করার সময় এসেছে।

❐

৪. ইসলামী বিপ্লব কি ?

ইসলামের সমর্থকদের দ্বারা একটি সরকার গঠিত হলেই ইসলামী বিপ্লব হয়ে যায় না। অতীতে এমন সরকার অনেক দেশে এসেছে কিন্তু ইসলাম সেখানে বাস্তবায়িত হয়নি। হাতে কুরআন আর মুখে ইসলামের শ্লোগান এমন কোন দলের সরকারও ইসলামী বিপ্লবের সরকার নাও হতে পারে। কেননা এমন সরকার অতীতেও জনগণ দেখেছে, আজও দেখছে।

ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমদের দ্বারা গঠিত একটি সরকার ক্ষমতায় এলেই ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করারও কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

ইসলাম একটি সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতির নাম। অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লব একটি সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়নকারী বিপ্লবেরই নাম। যে মানুষকে নিয়ে বা যে মানুষের কল্যাণের জন্য বিপ্লব সে মানুষের মধ্যে যদি বিপ্লব বা পরিবর্তন না আসে তাহলে ইসলামী বিপ্লব হতে পারে না। বিপ্লব বলতে অনেকে হঠাৎ বা আকস্মিক পরিবর্তনকে বুঝেন। আকস্মিক পরিবর্তন, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, নৈরাজ্য, সংস্কার, সরকার যন্ত্রের পরিবর্তন বা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন এসবের কোনটাই ইসলামে বিপ্লব বলে চিহ্নিত বা আখ্যায়িত করা হয়নি। ইসলামে বিপ্লবের ধারণাটাই এসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা লাভকেই ইসলাম বিপ্লবের জন্য যথেষ্ট মনে করে না। কেননা কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহর এবং বান্দা সর্বাবস্থায় দায়িত্বশীল বা দায়িত্ব প্রাপ্ত। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে আল্লাহর দেয়া সুযোগ ও ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করবে এবং আল্লাহর দাস হিসেবে তার নিজ দায়িত্ব পালন করবে মাত্র।

রসূল (সা) যে মডেল স্থাপন করেছেন ইসলামী বিপ্লবের মডেল সেটাই। ইসলামী বিপ্লব তো বিপ্লব এ অর্থে যে, এ বিপ্লব মানুষের কাঠামোতে নয় বরং মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি-দৃষ্টিভংগী, পছন্দ-অপছন্দ অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রের পরিবর্তন এনে দেয়।

ইসলামী বিপ্লবের অর্থ ইনসাফ, শান্তি, নিরাপত্তা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। অন্য অর্থে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা। ইসলামের মতে আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর রাজ কায়েম হওয়ার এ বিপ্লব এমনিতেই আসে না। অর্থাৎ ইতিহাস এবং বিপ্লব কখনো নিজে নিজেই আসে না।

আকস্মিকতা এবং শক্তি প্রয়োগকে অনেকে বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য মনে করে। কিন্তু ইসলামে বিপ্লবের তেমন কোন ধারণা নেই।

ইসলামী বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং এ বিপ্লব বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বিত এক প্রগতিশীল প্রক্রিয়ার নাম। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط-

"আল্লাহ সেই জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে না।"-(সূরা আর রা'দ ঃ ১১)

ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে একটি জনগোষ্ঠী যদি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে কেবল মাত্র আল্লাহ সেই জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন করেন। আসলে মানুষই হচ্ছে ইতিহাসের নির্মাতা এবং পরিবর্তনকারী। জনগণের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের উপরই নির্ভর করে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন।

সুতরাং ইসলামী বিপ্লব হচ্ছে একটি ব্যাপক, বাস্তব ভিত্তিক, নিরবচ্ছিন্ন, গতিশীল, গভীর বিপ্লব। সেই সাথে এ বিপ্লব হবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, শোষণ-নিপীড়ন ও আধিপত্যবাদ বিরোধী, একনায়কত্ব ও স্বৈরাচার বিরোধী। এ হবে এমন এক সার্বজনীন বিপ্লব যাতে থাকবে আধ্যাত্মিকতা, ইসলামের সঠিক মেজাজ ও প্রকৃতির প্রতিফলন। বিপ্লবের নেতৃত্ব, আবেদন, পথ এবং পন্থা হবে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী এবং আল্লাহর রংয়ের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটবে এ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

ইসলামের জন্য সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, প্রয়াস, সাধনা, খেদমত সবকিছুই ইসলামী আন্দোলন বলে বিবেচিত হলেও বিপ্লব হচ্ছে একটি সামগ্রিক এবং ব্যাপক পরিবর্তনের নাম।

সত্যিকার ইসলামী বিপ্লব তাই যা আদর্শিক, রাজনৈতিক এবং কর্মসূচীগত-ভাবে পূর্ণতা লাভ করে। ইসলাম বাস্তবায়নের অর্থই হলো জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনয়ন। ইসলামী আন্দোলন যেমন শুধু মুসলমানদের জন্য নয় তেমনি ইসলামী বিপ্লবও হচ্ছে গোটা মানবতার বিপ্লব।

❐

৫. ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী বিপ্লবের যে সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা উপরে করা হয়েছে সেটিই সত্যিকার অর্থে বিপ্লব। আর এ বিপ্লব অর্জনের পথ ও পন্থা কি হতে পারে এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোকপাত করার দাবী রাখে।

অলৌকিক বা আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনার মত কি কোন বিপ্লব আসতে পারে ? পৃথিবীর ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে যে, কোন দেশে বা সমাজে তেমন একটি বিপ্লব হঠাৎ করে সম্পন্ন হতে পারে না। ইসলামের ইতিহাসের বিপ্লবের আলোচনায় প্রথমে না গিয়েও দেখা যায় যে, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব বা চীনের বিপ্লব হঠাৎ করে আসেনি। ওসব বিপ্লবের পটভূমিকা রচনার পিছনেও আছে বিশাল এবং দীর্ঘ ইতিহাস। সুতরাং প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণের সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপ্লবের প্রত্যাশা অর্থহীন। সম্প্রতি ইরানে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে বাইরের জগতের কাছে এটাকে আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হলেও ইরানী জনগণের কাছে যে এটি দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিপ্লবকে যারা সামান্যও জানার চেষ্টা করেছেন তাদের স্বীকার করতেই হবে যে, অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করেই সম্পন্ন হয়েছে এ বিপ্লব। ইরানে যা হয়েছে ওভাবেই আরেকটি দেশে ঘটবে বিপ্লব এ ধারণা করার কোন কারণ নেই। বিষয়টির গভীরে না গিয়ে এমন আশাবাদ কেউ করতে পারেন। কিন্তু সেই আশাবাদ শেষ পর্যন্ত যে আশাবাদই থেকে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। প্রত্যেকটি দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই নির্ধারণ করবে কোন দেশে কিভাবে বিপ্লব আসতে পারে।

বস্তুবাদীদের বা সমাজতান্ত্রিকদের ধারণায় যে বিপ্লব ইসলাম তাও অনুমোদন করে না। এদের মতে সমাজের পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তি কোন কার্যকরী শক্তি নয়। প্রাকৃতিক আইন এবং নিয়ম দ্বারাই সমাজ বিকশিত হয়, পরিবর্তিত হয়। অবৈধ বা যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলকে এরা বিপ্লব বলে।

আবার অনেকে মনে করেন, জননন্দিত কোন বীর পুরুষ বা ব্যক্তিত্ব হচ্ছে পরিবর্তন বা বিপ্লবের চালিকাশক্তি। এদের মতে আইন কাঠামো বা বিধিব্যবস্থা হচ্ছে শক্তিশালী বা ক্যারিসম্যাটিক ব্যক্তিত্বের হাতের যন্ত্র মাত্র। তারা যেভাবে চান পরিবর্তন ঠিক সেভাবেই আসে। সাধারণ মানুষের কোন অবদান বিপ্লবে নেই। তাদের কাছে মূল উপাদান হচ্ছে অসাধারণ ক্ষমতাবান

ব্যক্তিত্ব। বলা হয়ে থাকে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। বীরের বীরত্ব মানুষকে অভিভূত করে। কিন্তু বীর পুরুষের উপস্থিতিই বিপ্লবের কারণ হতে পারে না।

অনেকে এটাও মনে করেন যে, আহলে রায় জনগোষ্ঠী বিপ্লবের প্রধান উপকরণ এবং তারাই সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। গণতন্ত্রের মতে সর্বোত্তম সরকার ব্যবস্থা তাই যাতে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি গণতন্ত্রও একথা বলেনি যে, সাধারণ জনতাই পরিবর্তন বা বিপ্লবের একমাত্র সিদ্ধান্তকারী শক্তি।

❒

৬. বিপ্লব এনেছে জনতা

অলৌকিক কিংবা আকস্মিকভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন হতে পারে। এটি অসম্ভব কিছু নয়। তবে তাকে বিপ্লব বলা যাবে না। সেটা ক্ষমতার হাত বদল মাত্র। মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্র 'সর্বহারাদের বিপ্লবের' যে ধারণা দেয় ইসলামের নিকট তাও গ্রহণযোগ্য নয়। শক্তিমান সিংহ পুরুষ ডাক দিবেন আর বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাবে ইসলামে এমন ধারণার অবকাশ নেই। আল্লাহর নবী রসূলদের চাইতে আর কেউ তো সিংহ পুরুষ বা শক্তিমান বা ক্যারিসম্যাটিক হতে পারেন না।

কিন্তু নবী রসূলগণ কি ডাক দিয়েই বিপ্লব সম্পাদিত করেছিলেন ? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্‌সাল্লামের চাইতে শক্তিমান পুরুষ বা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দুনিয়াতে আর কে হতে পারেন ? মক্কাবাসীকে ডাক দেয়ার সাথে সাথেই কি বিপ্লব এসেছে ? তাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। সে পথ ছিল সংগ্রামের পথ। যে মানুষের জন্য বিপ্লব চাই সে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্যে সংগ্রাম করেছেন তিনি। যে রাসূল (সা) বিশ্বের ইতিহাসের সেরা বিপ্লবী সে রাসূলের ভূমিকা ছিল একজন বাণীবাহকের, পথ প্রদর্শকের বা সতর্ককারীর। রাসূল (সা)-এর নেতৃত্বে বিপ্লব এনেছে সেই জনতা যে জনতার কল্যাণের জন্যই এসেছিলেন রাসূল (সা)। ইসলামে নবীর দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে পথ প্রদর্শন ও সত্যের সন্ধান দেয়া। সেই সাথে জনগণকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত ও সংগঠিত করা, সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করা। সত্যকে জনগণ গ্রহণ করবে কি বর্জন করবে, এটি তাদেরই সিদ্ধান্ত। সুতরাং দৈবাৎক্রমে কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। যা কিছু ঘটবে তা মানুষের সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যক্রমেরই ফলশ্রুতি।

❒

৭. জনতাই ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে

ইসলামের মতে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিত্ব, অলৌকিকতা বা কোন বিধি বিধান মৌলিক উপাদান নয়। পরিবর্তনের মৌলিক উপাদান হচ্ছে মানুষ এবং মানুষ। জনগণ বা মানুষই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক পরিবর্তনের মৌলিক এবং কার্যকর উপাদান। সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র তথা বিশ্বের সবকিছুর দায় দায়িত্বের বোঝা ইসলাম চাপিয়ে দিয়েছে মানুষের উপর। মানুষ বা জনগণ হচ্ছে সমাজের পরিবর্তন বা উত্থান পতন ও অগ্রগতির মূল উপাদান। জনগণের অর্থ হলো সমগ্র জনতা। এ জনতাই ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলাম জনগণকেই বিপ্লবের মূল চাবিকাঠি বা প্রধান শক্তি মনে করে। ইসলাম সমগ্র মানব মণ্ডলীকে তার পরিণতির জন্য যেমন দায়ী করেছে তেমনি যে মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত সে ব্যক্তি মানুষকেও দায়ী করে এবং ব্যক্তি মানুষটিকেই জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

যারা ইসলামী বিপ্লবের প্রত্যাশী এ বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট হতে হবে যে, প্রকৃতিগতভাবেই এ বিপ্লবের ভিত্তি হবে ইসলামী আদর্শ। সুতরাং ইসলামী বিপ্লবের বিশেষ পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বস্তুবাদী বিপ্লব, মুক্তি বা স্বাধীনতার বিপ্লব থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর হতে বাধ্য। এর অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, ইসলামী বিপ্লব, স্বাধীনতা, মুক্তি বা জনসাধারণের কল্যাণের প্রশ্নে নীরব বা এসব বিষয় বিবেচনা করে না। পক্ষান্তরে এর সবকিছুই ইসলামী বিপ্লবে সমন্বিত বা সন্নিবেশিত। যেহেতু ইসলাম একটি সামগ্রিক এবং পরিপূর্ণ, বিশ্বজনীন বিপ্লবী আদর্শ তাই মানবতার মুক্তি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মানব কল্যাণ, সাম্য, ইনসাফ আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় অর্থই ইসলামী বিপ্লবের মধ্যে বর্তমান। ইসলাম যেহেতু কতিপয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই ইসলামী বিপ্লব হচ্ছে সার্বজনীন এক বিশিষ্ট চিন্তাধারার জীবন প্রবাহ, বিশ্বদৃষ্টি, সামগ্রিক মানবতা এবং মানবীয় তৎপরতার প্রতিফলন।

❐

৮. ইসলামী বিপ্লবের দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঃ-

১. ইসলামী বিপ্লবের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিন্তা ও মনোজগতে বিপ্লব এবং পরিবর্তন আনয়ন।

২. দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এ বিপ্লব হবে জনগণের বিপ্লব এবং জনজীবনে আনবে বিপ্লব বা পরিবর্তন। অর্থাৎ ইসলামের মতে জনগণের মানসিক পরিবর্তন এবং জনগণের পরিবর্তনই ইসলামী বিপ্লবের মূল জিনিস।

সেই মূল উপাদানটি কি যা একটি সমাজকে অকস্মাৎ পরিবর্তন করে দেয়। সম্পূর্ণরূপে তার বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য এবং অবয়ব বা কাঠামো একেবারেই বদলে দেয়? ইতিহাসের এই চালিকাশক্তিটি কি? যে জনগণের মধ্যে বা যে জনগণের কল্যাণের জন্য বিপ্লব সাধন প্রয়োজন আসলে সেই জনগণই ইতিহাসের ঐ চালিকাশক্তি। জনগণকে সম্পৃক্ত না করে কোন বিপ্লব আসতে পারে না। নবী রাসূল আম্বিয়া কেরামগণের (আ) আবির্ভাবের পর এমনিতেই কোন পরিবর্তন বা বিপ্লব আসেনি। জনগণ যতক্ষণ ঐ বিপ্লবে শামিল না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সমাজে কোন বিপ্লব আসেনি।

❒

৯. ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তি

তৌহিদ ঃ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। মানুষের উপর মানুষের কোন ধরনের প্রভুত্ব ও আধিপত্য চলতে পারে না। মানুষ স্বাধীন এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তির অধীন নয়। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সর্বময় অধিকারী আল্লাহ, মানুষ নয়।

রেসালাত ঃ মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সামষ্টিকভাবে আল্লাহর কাছে দায়িত্বশীল এবং পরস্পরের প্রতিও দায়িত্বশীল এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি দায়িত্বশীল। দ্বীন ইসলাম একমাত্র অবতীর্ণ বিধান এবং নবীদের ওহী বা প্রত্যাদেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে এই দায়িত্ব দিয়ে। রিসালাতের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলামের চিরন্তন বাণী সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে।

ন্যায় বিচার ঃ মুসলিম ব্যক্তি ও সমষ্টিকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এবং বিশ্বজগত, মানবতা, প্রকৃতি এবং এর সম্পদের প্রতি ন্যায় বিচারের সাথে আচরণ করতে হবে।

খিলাফত ঃ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি এবং সৃষ্টি জগতের সেরা। সকল মানুষকে আল্লাহ সম অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ মানুষ মাত্রই আল্লাহর নিকট সমান। আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের শাসন কায়েম করবে। মুসলমানদের ইসলাম এ শিক্ষাই দেয় যে তারা মানবতাকে খেলাফতের দায়িত্বের পথে পরিচালিত করবে।

ইসলামী বিপ্লব তার নিজস্ব গতিধারায় চলবে। কোথাও এর ব্যর্থতা ইসলামের সামগ্রিক ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত হতে পারে না। কেননা এটা হচ্ছে মুসলিমদের আদি কাল থেকে শুরু হওয়া সব আন্দোলন ও সংগ্রামের একটি সামগ্রিক অব্যাহত প্রক্রিয়া। বর্তমান শতাব্দীতেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে এবং নতুন গতি লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এটি অব্যাহত থাকবে।

❐

১০. বিপ্লব রপ্তানি করা যায় না

বিপ্লব রপ্তানির সমাজতান্ত্রিক বা পাশ্চাত্য কোন ধারণা ইসলাম সমর্থন করে না। বরং ইসলাম তার নিজস্ব শক্তিগুণেই কোন একটি জনপদে বিপ্লব করতে সক্ষম। কোথাও বিপ্লব রপ্তানির ধারণা মেনে নিলে প্রশ্ন আসে যে দেশ থেকে বিপ্লব রপ্তানি করা হবে সে দেশের বিপ্লবটি কোথা থেকে রপ্তানি করা হলো। সে বিপ্লব যদি রপ্তানি করা বিপ্লব না হয়ে থাকে এবং সেখানকার জনগণ যদি বিপ্লব সংঘটিত করে থাকেন তাহলে অন্য কোন দেশেও বিপ্লবের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বিপ্লব আসতে পারে। ইসলামী বিপ্লব যেহেতু শোষণ ও নির্যাতন বিরোধী সেহেতু মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে গোটা জনশক্তির উপরই এ বিপ্লবের সুপ্রভাব পরিদৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ সার্বজনীনতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইসলামী বিপ্লবে।

❒

১১. ইসলামী বিপ্লব সার্বজনীন

ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণভাবে সুশোভিত এক আদর্শের নাম সেহেতু ইসলামী বিপ্লব কোন ধরনের বর্ণবাদ, গোষ্ঠীবাদ, গোত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, শ্রেণী সংঘাত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বস্তুবাদ কোন কিছুকেই স্থান দিতে পারে না বা প্রশ্রয় দিতে পারে না। এমনকি ইসলামী বিপ্লব ইসলামের সার্বজনীন রূপের বাইরে বিশেষ কোন প্রবণতাকেও প্রশ্রয় দিতে পারে না।

ইসলামী বিপ্লব মানে সমগ্র উম্মাহর বিপ্লব। এটি বিশেষ কোন দেশ, কাল ও পাত্রের বিপ্লব নয়। কিংবা কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের সাথেও সংশ্লিষ্ট নয়। ইসলামী আন্দোলন যেমন 'জাতি পূজারি বা দেশ পূজারি' হতে পারে না তেমনি ইসলামী বিপ্লবও কোন বিশেষ দেশ বা জাতীয় সীমার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না।

বিদেশ নির্ভর কোন ধ্যান ধারণা দিয়ে ইসলামী বিপ্লব হয় না। জনগণের মধ্য থেকেই বিপ্লবী শক্তির উত্থান হতে হবে। মহা বিপ্লবের মহানায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিপ্লবী কাফেলায় জনগণ শরীক হয়েছিল এবং বিপ্লব জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে ছিলো সংগতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে রাশিয়ার ১৯১৭ সালের বিপ্লব বা চীনের ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের আদর্শ তথাকথিত মার্ক্সবাদ রাশিয়া বা চীনের জনগণের আদর্শ ছিলো না। কিংবা তাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তুও ছিলো না। ফলে বিপ্লবের নামে রাশিয়া এবং চীনে যে ঐতিহাসিক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইসলামী বিপ্লব নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের বিপ্লব ছিল বলেই চিহ্নিত একটি মহল অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ছাড়া সাধারণভাবে জনগণ ইসলামী বিপ্লবকে জানায় প্রাণঢালা অভিনন্দন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় এ অবস্থা অব্যাহত ছিল।

১২. ইসলামী বিপ্লব প্রসংগে মাওলানা মওদূদী

ক. ইসলামের স্বাভাবিক পন্থায় একটি রাষ্ট্র বিপ্লব

ইসলামী বিপ্লব একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম দেয়। যাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করা যায়। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে একটি আদর্শ রাষ্ট্র। ইসলামের স্বাভাবিক পন্থা অনুসরণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হওয়াকেই বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ইসলামী বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসংগে তিনি ১৯৪০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বলেন, "একটি রাষ্ট্রের বাস্তবায়নের জন্য কিছুটা প্রাথমিক আয়োজন প্রস্তুতি, সামাজিক উদ্যম-উদ্দীপনা এবং কিছুটা প্রাথমিক ঝোঁক প্রবণতা এমনভাবে বর্তমান থাকা চাই যার নিবিড় সমন্বয়ে ও ঘটনা প্রবাহের অনিবার্য চাপে স্বাভাবিক পন্থাই একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রগুলো পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করলেই তার সিদ্ধান্ত যেমন স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে, রসায়ন শাস্ত্রে—যেমন রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উপাদানসমূহ বিশেষ প্রক্রিয়ায় পদার্থ প্রস্তুত হয় সমাজ বিজ্ঞানেও সেইরূপ একটি বিশেষ সমাজ পূর্ব হতে বর্তমান অবস্থা পারম্পর্যের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই জন্মলাভ করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের জন্ম ও গঠনের গোড়ায় যেসব অবস্থা বর্তমান থাকে, তার প্রকৃতি অনুসারেই নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও স্বরূপ। ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রগুলো পর্যায়ক্রমে সাজালে যেমন তার সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ হতে পারে না, বিশেষ গুণ সম্বলিত রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে যেমন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী মিশ্র পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে না, লেবুর বীজ হতে উদ্ভূত বৃক্ষ যেমন আম ফলাতে পারে না, অনুরূপভাবে বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার অনুকূল শর্তসমূহ বর্তমান থাকলে এবং তার পারস্পরিক মিলিত কার্যক্রম ধরনের রাষ্ট্র গঠনের অনুকূল হলে তা ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রাষ্ট্র জন্ম দিতে পারে না। রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ধারণে ব্যক্তি এবং সমাজের ইচ্ছা ও কর্মশক্তির গুরুত্ব অত্যধিক। যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা করতে হবে প্রথম থেকেই তার স্বভাব ও প্রকৃতির অনুরূপ উপাদান ও কার্যকারণ সংগ্রহ করা এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার মত কর্মপন্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য, সে জন্য যে ধরনের আন্দোলন, যে রকম ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্র এবং যে ধরনের নেতৃত্ব ও সামাজিক কার্যকলাপ অপরিহার্য আগে থেকে সেগুলো ঠিক তদনুযায়ী হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এই সমস্ত কার্যকারণ ও উপাদানগুলো

সংগৃহীত ও পরস্পর মিলিত হয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা-সাধনা করার পর তার শক্তি যখন অত্যন্ত মজবুত হয় এবং বিপরীতধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিরোধ করার মত শক্তি অর্জিত হয় তারপরই অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে সেই ঈপ্সিত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একটি বীজ থেকে যেমন বৃক্ষ জন্মে এবং আভ্যন্তরীণ সক্রিয় শক্তিতে তা ক্রমবর্ধনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে একটি বিশেষ সীমানায় পৌঁছে ঠিক সে ধরনেরই ফল দিতে শুরু করে, যে ধরনের ফল ধারণ করার জন্য তার আভ্যন্তরীণ শক্তি দীর্ঘদিন ধরে নিরন্তর প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হয়েছে। এ নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা স্বীকার করতে কারও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হবে না যে, যেখানে আন্দোলন সংগঠন, নেতৃত্বে ব্যক্তিগত স্বভাব ও সমষ্টিগত চরিত্র এবং কর্মকুশলতা সবকিছুই এর বিপরীত ধরনের কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা নিতান্ত অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা এবং খোশখেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৩]

মাওলানা মওদূদীর উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান।' জনগণ যে প্রত্যাশা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়েছিল একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপাদান, কার্যকারণ এবং সংগঠন, আন্দোলন ও নেতৃত্বের সমন্বয় না ঘটায় পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ইসলামের নামে অর্জিত ঐ রাষ্ট্রটি ইসলামী বিপ্লবের সিঁড়ি অতিক্রম করে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিগণিত হতে পারেনি।

মাওলানা মওদূদীর মতে ইসলামী রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণরূপে একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব হতে এ রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। ফরাসী বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লব পর্যালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেন, "মানব ইতিহাসের এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদের গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে যায় এবং জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত ভাবধারার অনুপ্রবেশে আদর্শচ্যুত হয়। আদিকাল হতে আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র পন্থা যা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে খাঁটি আদর্শবাদের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। তাই ইসলাম এর নিজস্ব আদর্শ অনুসারে সমগ্র বিশ্বমানবকে একটি উদার অজাতীয়তাবাদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানায়।"[৪]

খ. মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হলেই ইসলামী রাষ্ট্র হয় না

মুসলমানদের কর্তৃত্বে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হলেই যে তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে এর কোন গ্যারান্টি নেই। আজকের মুসলিম বিশ্বই এর প্রমাণ।

মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোও শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে ন্যাশনষ্টেটেই পরিণত হয়েছে।

"ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগের প্রত্যেক কাজেই এমন লোকের প্রয়োজন যাদের মনে সর্বোপরি খোদার ভয় আছে, যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তীক্ষ্ণ, যারা দুনিয়া অপেক্ষা পরকালকেই শ্রেয় মনে করে, যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ-ক্ষতির মূল্য ও গুরুত্ব পার্থিব লাভ-লোকসান অপেক্ষা বহুগুণে অধিক, যারা দৃঢ়তার সাথে ইসলামের আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতি অনুসারে কাজ করবে, যাদের জীবনের সকল চেষ্টা-সাধনা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগের একমাত্র লক্ষ্য খোদার সন্তোষ বিধান। ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এমন নিঃস্বার্থ কর্মী আবশ্যক যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের দাসত্ব করবে না, যাদের দৃষ্টি সংকীর্ণতার ঊর্ধে, যাদের মনে হিংসা-বিদ্বেষের স্থান নেই, যারা ধন-দৌলত ও হুকুমাত প্রভুত্বের নেশায় মত্ত হবে না, যাদের মধ্যে ঐশ্বর্যের লালসা, প্রভুত্বের লিপ্সা থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন কর্মচারী গড়ে তুলতে হবে যাদের নৈতিক শক্তি এত বলিষ্ঠ হবে যে, পৃথিবীর বিপুল ধন-ভাণ্ডার তাদের হস্তগত হলেও তারা আমানতদার প্রমাণিত হবে। রাজশক্তি করায়ত্ত হলে তারা রাতের সুখনিদ্রা ভুলে জনস্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণে সতর্ক দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ প্রহরায় আত্মনিয়োগ করবে, যাতে দেশের জনগণের জানমাল ও মানসম্ভ্রম সম্পর্কে কোন আশংকা না থাকে। যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যখন তারা পররাজ্যে প্রবেশ করবে, তখন সে দেশের অধিবাসীগণ পাইকারী হত্যা, জুলুম, পীড়ন, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে এবং গুণ্ডামী, ব্যভিচার ও বলাৎকারের ভয়ে সন্ত্রস্ত হবে না। বরং বিজয়ী বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিককেই বিজিত দেশের জনগণ তাদের জানমাল ও আবরুর রক্ষকরূপে দেখতে পাবে। বস্তুতঃ একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ লোকেরই আবশ্যক।[৫]

গ. ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি অপরিহার্য

"ইসলামী রাষ্ট্র কোন অলৌকিক ঘটনায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে জন্য গোড়া থেকেই ইসলামের বিশিষ্ট জীবন দর্শন ও জীবন পদ্ধতি এবং ইসলামী চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতির বিশেষ মাপকাঠি অনুযায়ী গঠিত একটি বিরাট ও ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি অপরিহার্য। সে আন্দোলনের নেতা, পুরোধা ও কর্মী হবেন এমন লোক যারা মানবতার এই বিশিষ্ট আদর্শে আত্মগঠন করতে প্রস্তুত থাকবেন। অতঃপর তারা সমস্ত সমাজ মনে অনুরূপ মনোভাব ও নৈতিক অনুপ্রেরণা জাগ্রত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগে সচেতন থাকবেন। এতদ্ব্যতীত ইসলামের উল্লেখিত ভিত্তিতে এক অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করাও

আবশ্যক যা সঠিক ইসলামী আদর্শে নাগরিকদের জীবন গঠন করবে এবং মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম ঐতিহাসিক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ, মুসলিম আইনজ্ঞ, মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক—এক কথায় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় খাঁটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা ও কাজ করতে লোক গড়ে তুলবে।"

ঘ. আত্মত্যাগী নেতৃত্ব

তাদের মধ্যে খালেছ ইসলামের আদর্শে চিন্তা ও মতবাদের এক পূর্ণ ব্যবস্থা এবং কর্মজীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা রচনার সামর্থ্য বর্তমান থাকা চাই, যে শক্তি দ্বারা তারা দুনিয়ার খোদাদ্রোহী চিন্তা-নায়কদের বিরুদ্ধে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। বুদ্ধি ও মনন শক্তি এই বিপ্লবী পটভূমির ভিত্তিতে এহেন ইসলামী আন্দোলন চারিদিকের যাবতীয় অবাঞ্ছিত জীবনধারার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম করবে। সেই সংগ্রামে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে, নির্যাতন ও নিষ্পেষণ অকাতরে সহ্য করে আত্মদান করে, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েও তাদের অন্তরের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও আদর্শের দৃঢ়তা প্রমাণ করবে। পরীক্ষার অগ্নিদহন সহ্য করে তারা এমন নিখাদ স্বর্ণে পরিণত হবেন যে, যে কোন পরীক্ষায় কষ্টিপাথরে যাচাই করেও তাদের থেকে এতটুকু খাদ বের করা সম্ভব হবে না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় নিজেদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ দ্বারাই তারা নিজেদের সেই আদর্শবাদিতার বাস্তব প্রমাণ পেশ করতে সমর্থ হবে। তাদের প্রত্যেকটি কথাই দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারবে যে, এসব নিঃস্বার্থ, নিষ্কলুস, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, ত্যাগী, আদর্শবাদী, চরিত্রবান ও খোদাভীরু লোক মানবতার কল্যাণের জন্য যে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে, তাতে নিঃসন্দেহে নিখিল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ, সুবিচার ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নিহিত রয়েছে। এরূপ ধারাবাহিক অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গেলে সমাজের যেসব লোকের ন্যায় ও সত্যের উপাদান অন্তর্নিহিত রয়েছে। সকলেই ধীরে ধীরে এ আন্দোলনে যোগদান করবে। পক্ষান্তরে হীন প্রকৃতির দুর্বলতা ও নীচুমনা লোকদের প্রভাব সমাজ থেকে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হবে। এর ফলে জনগণের মনোজগতে এক প্রচণ্ড বিপ্লবের সৃষ্টি হবে। সমাজ মনে সেই বিশেষ ধরনের আদর্শবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবী যেমন জেগে উঠবে, এর প্রয়োজনবোধ ও চাহিদাও অনুরূপভাবে বেড়ে যাবে। সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতীত অন্যবিধ ব্যবস্থা দানা বাঁধার অবকাশ পাবে না। সর্বশেষ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী রূপে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাই কায়েম হবে, যার জন্য এতদিন যাবত অক্লান্ত চেষ্টায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

করা হয়েছে। আর সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগে সংগেই সেই বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাবে তা পরিচালনার জন্য নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী থেকে শুরু করে উজির ও শাসনকর্তা পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মকর্তা প্রস্তুত হবে। কোন দিকে রাষ্ট্রের কোন বিভাগেই কর্মকর্তার অভাব হেতু কাজ বন্ধ হওয়ার আশংকা থাকবে না।"[৬]

ঙ. সেই ধরনের আন্দোলন চাই

বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এটাই হচ্ছে একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা। একেই বলা হয় ইসলামী ইনকিলাব। পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস সর্বজনজ্ঞাত। কোন বিশেষ ধরনের বিপ্লব সৃষ্টির জন্য গোড়াতেই সেই বিশেষ ধরনের আন্দোলন, সেই বিশেষ ধরনের নেতা ও কর্মচারী, সেই বিশেষ ধরনের সামাজিক ও সামগ্রিক চেতনা এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির অপরিহার্য প্রয়োজন অনস্বীকার্য। রুশো, ভলটেয়ার এবং মনটেস্কিত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল ধরে ফ্রান্সে যে বিশেষ আদর্শের নৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন, তার ফলেই সেখানে তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিপ্লব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। রুশ বিপ্লব কেবল মার্ক্সের চিন্তাধারা, লেলিন ও স্ট্যালিন নেতৃত্ব আর কমিউনিজমের মতাদর্শে সুশিক্ষিত হাজার হাজার কমিউনিষ্ট কর্মীর বিপ্লবী কার্যকলাপের দ্বারাই সৃষ্টি হতে পেরেছিল, অন্য কোন উপায়ে নয়। তদ্রূপ ইসলামী বিপ্লবও তখনই সৃষ্টি হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন কোরআনের আদর্শ ও মতবাদ এবং নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সা)-এর চরিত্র ও কার্যকলাপের বুনিয়াদে কোন গণ-আন্দোলন জেগে উঠবে আর সমাজ জীবনের সমগ্র মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদকে একটি প্রবলতর সংগ্রামের সাহায্যে একেবারে আমূল পরিবর্তন করে ফেলা সম্ভব হবে।"[৭]

চ. ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের বৈশিষ্ট্য

"আল্লাহ তায়ালার কালেমার প্রচার এবং তার দ্বীন ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বলতে যা বুঝায় সেজন্য চাই এমনসব একনিষ্ঠ কর্মী যারা খাঁটিভাবে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে কোন প্রকার লাভ ক্ষতির বিন্দুমাত্র পরোয়া না করেই খোদার আইন ও বিধানের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এমন কর্মী আমাদের বংশানুক্রমিক মুসলিম সমাজের মধ্য থেকেই আসুক কিংবা অন্য কোন জাতির মধ্য থেকে এসে এই দলে নতুনভাবে শামিল হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কিন্তু একথা অবধারিত সত্য যে, এই ধরনের বিপ্লবী কর্মী ব্যতীত এই বিরাট কাজ কখনই সম্পন্ন হতে পারে না।"[৮]

বতর্মান মুসলিম সমাজের মর্মান্তিক অধঃগতির বর্ণনা করে মাওলানা মওদূদী বলেন, "চরিত্রের দিক দিয়ে যত প্রকারের মানুষ দুনিয়ার অমুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়, ঠিক তত প্রকারের মানুষ এই মুসলিম নামধারী জাতির মধ্যেও বর্তমান। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে অমুসলমান যতখানি সক্ষম ও নির্ভীক মুসলমানগণ সে অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। ঘুষ, সুদ, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, ধোঁকা ও প্রতারণা এবং অন্যান্য সকল প্রকার অপরাধ অমুসলিমগণ যে হারে করে মুসলমানগণ সে অপেক্ষা কিছুমাত্র কম করে না। বিশেষ স্বার্থলাভ এবং অর্থোপার্জনের জন্য কাফেরগণ যে অপকৌশল অবলম্বন করে মুসলমানগণও তা করতে কুণ্ঠিত হয় না। মুসলিম আইন ব্যবসায়ী জেনে বুঝে প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে ওকালতি করে সেই মুহূর্তে একজন অমুসলিম ব্যক্তি আল্লাহকে যতখানি ভুলে যায়, একজন মুসলিম আইন ব্যবসায়ীও ঠিক ততখানিই ভুলে যায়। একজন মুসলিম ধনশালী ব্যক্তি ঐশ্বর্য লাভ করে কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দখল করে সেইসব কার্যকলাপ করে থাকে যা করে একজন অমুসলিম ব্যক্তি। যে জাতির নৈতিক অবস্থা এত হীন ও এত অধঃপতিত তারা সেই নানা মতের ও নানা প্রকৃতির বিরাট জনতার ভীড় জমিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে দিলে কিংবা রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে তাদেরকে শৃগালের ন্যায় চতুর করে অথবা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করে তাদের মধ্যে ব্যাঘ্রের হিংস্রতা জাগিয়ে তুললে অরণ্য জগতে প্রভুত্ব লাভ করা হয়তবা সহজ হতে পারে, কিন্তু তার সাহায্যে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ইসলামের কোন প্রচার বা ইসলামী হুকুমাত কায়েম হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। কারণ এমতাবস্থায় দুনিয়ার কেউই তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে না, কারো দৃষ্টি তাদের সম্মুখে শ্রদ্ধায় অবনমিত হবে না, তাদের দেখে কারো মনে ইসলামের আপোষহীন ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা জাগ্রত হবে না।" আমাদের বর্তমান জাতীয় চরিত্রে এই যে চিত্র তা সামনে রেখে অনায়াসেই বলা যায় যে, এ ধরনের লক্ষ লক্ষ লোকের বিরাট ভীড় অপেক্ষা ১০ জন মাত্র বিপ্লবী কর্মী ইসলামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অধিকতর কৃতিত্ব ও সাফল্যের সাথে পরিচালিত করতে পারে।

"এতদ্ব্যতীত দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের জন্য এমন এক দুরন্ত ও অনমনীয় নেতৃত্বের আবশ্যক যা এই বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মপথে ইসলামের মূলনীতি থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ বিচ্যুতিও কখনোই বরদাশত করবে না।" তিনি অত্যন্ত চমৎকার যুক্তিসহ প্রমাণ করেছেন যে, "সুবিধাবাদী এবং স্বার্থ শিকারী নেতৃত্ব দ্বারা ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই অসম্ভব।"

"রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল শিকড় সমাজ জীবনের গভীর তলদেশে মযবুতভাবে গেঁথে থাকে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ জীবনের অভ্যন্তরে এর মর্মমূলে কোন পরিবর্তন সূচিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কৃত্রিম উপায়ে শাসনতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রে কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।"[৯]

ছ. সামষ্টিক প্রস্তুতি প্রয়োজন

কোন ব্যক্তি বিশেষের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম সম্ভব নাও হতে পারে যদি সমাজ মানসে সমষ্টিগতভাবে সংশোধন ও পরিবর্তন গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি না থাকে। ব্যক্তিগত তাকওয়া পরহেজগারীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ তোগলক, আলমগীর এবং মামুনুর রশিদের মত ইতিহাসের পরাক্রমশালী শাসকগণ সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হননি। অবশ্য ব্যক্তিগত সততা এবং নিষ্ঠার কারণে অনেকেই অনেক ভাল কাজ করে যেতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তি বিশেষের শক্তি আধিপত্য ইতিহাসে অনেক অসাধ্য সাধন করেছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় সংস্কার সাধনের জন্য একটি শক্তিশালী টিম থাকা সত্ত্বেও সমষ্টিগত সামাজিক প্রয়াস না থাকার কারণে পূর্ণাংগ বিপ্লবের আশা করা যায় না। ইসলামের ইতিহাসে পঞ্চম খলিফা নামে খ্যাত হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজের কথা এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিরাট এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পরিবর্তন প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হলেও পূর্ণাংগ একটি ইসলামী সমাজ বিপ্লব সাধন সম্ভব হয়ে উঠেনি। সুতরাং সমাজের গভীর তলদেশ থেকে উল্লেখিত আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বস্তরের গণমানুষের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কেবলমাত্র নেতার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াসের ফলেই ইসলামী বিপ্লব সফল হতে পারে না। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি জাতি রাষ্ট্রের গায়ে ইসলামী হুকুমাত বা ইসলামী রিপাবলিক লেবেল বা সাইন বোর্ড লাগিয়ে দিলেই ইসলামী বিপ্লব আসবে না। বরং অভিজ্ঞতা বলে, সত্যিকার ইসলামী বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করার জন্য এ ধরনের লেবেল বা সাইন বোর্ড বেশী কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। এ প্রসংগে মাওলানা মওদূদী মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেছেন, "এমনকি একটি অমুসলিম রাষ্ট্র যেসব অপরাধের জন্য কারাদণ্ড দিবে মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র সেইসব ক্ষেত্রেই প্রাণদণ্ড বা নির্বাসন দণ্ড দান করবে। আর এ সত্ত্বেও মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাদের জীবদ্দশায় 'গাজী' ও 'বীর মুজাহিদ' এবং মৃত্যুর পর মহিমান্বিত বলে অভিহিত হবে। অতএব মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী হতে পারে বলে মনে করা একেবারেই

ভুল।"[১০] মাওলানার উদ্ধৃতি থেকে এটাও পরিষ্কার হলো যে, ইসলামী রাষ্ট্র বিপ্লবের জন্য নেতৃবৃন্দের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকার ধারণাও সঠিক নয়। নেতৃত্ব এবং জনগণ উভয়কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সক্রিয় নেতৃত্ব যেমন জনগণকে সক্রিয় করতে পারে আবার সক্রিয় জনগণ নেতৃত্বকে সক্রিয় করতে পারে।

❐

১৩. ইসলামী বিপ্লবের মডেল

ইসলামী বিপ্লবের যে বিশিষ্ট কর্মপন্থা তার মডেল হলেন স্বয়ং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা অন্যান্য নবী রসূলদের জীবন কাহিনী ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা খুব বেশী কিছু জানতে পারি না বা বিস্তারিত জানার সুযোগ নেই। কুরআন মজিদে তাদের সম্পর্কে যতটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে বিস্তারিত জানার কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে যত নেতার আবির্ভাব হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হলেন একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ নেতা। ইসলামী আন্দোলনের সূচনা থেকে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং এ রাষ্ট্র বিপ্লবকে সার্বিকভাবে সুসংহত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই। ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি, প্রশাসন ও আভ্যন্তরীণ শৃংখলা এবং পরিপূর্ণ একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে একমাত্র বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আদর্শ বা মডেল উপস্থাপন করে গেছেন। বিভিন্ন অধ্যায়ে সুস্পষ্ট কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করেই তিনি সাফল্যের দারপ্রান্তে পৌঁছেন।

❒

১৪. ইসলামী আন্দোলনের চিত্র

মাওলানা মওদূদী মহানবীর জীবন চরিত থেকে ইসলামী আন্দোলনের নিম্নোক্ত চিত্র এঁকেছেন ঃ "হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হলেন, তখন দুনিয়ায় নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাজ নৈতিক অসংখ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছিল। অবিলম্বে সেই সমস্যাবলীর আশু সমাধানও সকল দিক দিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুভূত হচ্ছিলো। রোম ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সর্বগ্রাসী মুখব্যাদান করে সীমান্তের অপর পারেই দণ্ডায়মান ছিলো। অবৈধ অর্থনীতি ও শোষণের যত উপায় হতে পারে তা সবই অবাধে চলছিল। নৈতিক পতন, অপরাধ প্রবণতা ও পাপের ঘুণ সমগ্র মানুষের অস্থিমজ্জা ও মেরুদণ্ড দুর্বল করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। হযরতের নিজের জন্মভূমিতেও এ ধরনের জটিল সমস্যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল এবং দেশ একজন সুদক্ষ নেতার নিপুণ হস্তের উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায় ছিলো। সমগ্র জাতি অজ্ঞতা, নীতিহীনতা, দারিদ্র্য, ব্যভিচার ও ঘরোয়া বিবাদ বিসম্বাদে নিমজ্জিত ছিল।

ইরাকের শস্য শ্যামল উর্বর প্রদেশসহ ইয়ামন পর্যন্ত আরবের সমস্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল ইরান সরকারের অধিকৃত ছিল। উত্তরে মূল হেজাজের সীমান্ত পর্যন্ত রোমকদের প্রবল আধিপত্য চলছিল। হেজাজের পুঁজিপতি ইহুদীদের নির্মম শোষণ ও উৎপীড়ন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। আরবদেরকে তারা চক্রবৃদ্ধি সুদের জালে জড়িয়ে অক্টোপাসে বেঁধে নিয়েছিল। পূর্ব উপকূলের অপর তীরবর্তী আবিসিনিয়ায় খৃষ্টান রাজত্ব চলছিলো। এ খৃষ্টান সরকারই মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মক্কানগরী আক্রমণ করেছিল। হেজাজ ও ইরানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থানরত 'নাজরান' জাতি খৃষ্টধর্মের অনুসারী এবং তাদের সাথে অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এভাবে তখন ছোট বড় অসংখ্য প্রকার সমস্যা বর্তমান ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বমানবতার পথ নির্দেশ ও নেতৃত্বের জন্য পাঠিয়েছেন, তিনি তদানীন্তন বিশ্বের এবং তার নিজ দেশের এসব জটিল সমস্যার দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেননি। বরং তিনি সকল দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে একমাত্র মূল কথার উপর পবর্তের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— "আল্লাহ ছাড়া অন্য সব প্রভুত্ব শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র এক আল্লাহরই দাসত্ব কবুল কর।"[১১]

১৫. ইসলামের মূল দাওয়াত

ক. একটি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে আহ্বান

অন্যসব সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি এজন্যই একটি মাত্র মূল কথার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কোন বিপর্যয়ের মূলীভূত কারণ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালাকে ত্যাগ করে অন্য কাকেও প্রভুত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাকেও প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করার মারাত্মক বিষ যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে, ততদিন ইসলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে কোন বাহ্যিক সংশোধন প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না, ততদিন ব্যক্তিগত অধঃপতন বা সামাজিক উচ্ছৃংখলতা দূর করাও সম্ভবপর নয়। যেহেতু স্থায়ী ও কার্যকরী সংশোধন প্রচেষ্টার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার দাসত্ব মুক্ত করে এক আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা, সেহেতু তিনি সেই কেন্দ্রবিন্দুর দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে মাত্র একজন প্রভু বিধান দাতা, মালিক তিনি—মহান আল্লাহ। প্রভুত্ব বা হুকুম চালাবার ব্যাপারে অন্য কারো কোন হুকুম চলবে না। মানুষ অন্য কারো প্রভুত্ব, দাসত্ব স্বীকার করতে পারে না, কারো আনুগত্য করতে পারে না বা কারো সামনে মাথা নত করতে পারে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছাড়া আর সবকিছুই এখানে অচল। কোন সরকার, অন্নদাতা, ভাগ্য নিয়ন্তা, প্রার্থনা ও ফরিয়াদ শুনার মত শক্তিমান আর কেউ নেই। সকল শক্তির উৎস আল্লাহ্ তায়ালা। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনিই একমাত্র রব, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, ক্রমবিকাশদাতা, মালিক প্রভু ও মাওলা। অন্য সব গোলামী আনুগত্য এবং আইনের বশ্যতা পরিহার করে একমাত্র আল্লাহর গোলাম ও অনুগত হতে হবে। আল্লাহর নবী সরাসরিভাবে এই বুনিয়াদী আহ্বান জনগণের সামনে পেশ করেছেন।

খ. কোন বাঁকা পথে নয়

আল্লাহর নবীর এই দাওয়াত ছিল অত্যন্ত সরল এবং পরিচ্ছন্ন। এ সম্পর্কে আবুল আ'লা মওদূদী (র) বলেন, "এই দাওয়াতকে কার্যকরী করার জন্য এবং এই ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি বাঁকা পথে অগ্রসর হননি। কিংবা প্রথমে সামাজিক বা মানবহিতকর কাজ করে লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এ আহ্বান পেশ করার পন্থা অবলম্বন করেননি। রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করে সরকারী ক্ষমতা দ্বারা তার মতবাদ জনগণের

উপর চাপাবার চেষ্টা করেননি। এভাবে বাঁকাচোরা পথ বা কাজ হাসিল করার অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নেয়া তিনি মাত্রই পছন্দ করতেন না।"[১২]

কেবলমাত্র ইসলামের বিপ্লবী কালেমায় তাওহীদের দাওয়াত যারা কবুল করেন কেবলমাত্র এ মহান সত্যকেই সমগ্র জীবনের কর্মবিধানের বুনিয়াদ বলে যারা গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতে যারা এ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত তারাই পারেন ইসলামের বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে। ইসলামী আন্দোলনের এ অপরিহার্য বাস্তবতা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, তাওহীদের এ বিপ্লবী দাওয়াতের জন্য কোন প্রাথমিক কার্যক্রমের আবশ্যক নেই, বরং তা প্রত্যক্ষভাবেই পেশ করতে হবে।

গ. তাওহীদের বিপ্লবী দাওয়াত

ইসলামী দাওয়াতের এ বিপ্লবী আহ্বানকে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন তিনি। "তাওহীদের এ বিপ্লবী ধারণাকে বিশেষ একটি ধর্মীয় মতবাদ মনে করলে ভুল হবে। বস্তুত তা একটি বাস্তব সত্য এবং মৌলিক তত্ত্ব। সাম্প্রতিক কালে মানুষের গোটা জীবন ব্যবস্থাকে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা, অন্য কথায় গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ও খোদায়ীর যে বুনিয়াদ গঠন করা হয়েছে, তাওহীদের এ বিপ্লবী দাওয়াত সেই বুনিয়াদের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে মানব জীবনের এক অভিনব ইমারত রচনা করে। আজও পৃথিবীর চারিদিকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে "আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলাহার" ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে চারিদিক মুখরিত করে তুলেছে। এ বিপ্লবী বাণীর ঘোষক মুয়াজ্জিন নিজেই জানে না সে কি ঘোষণা করছে। আর শ্রোতারাও তার তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করছে না। আশ্‌হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ এই ছোট ঘোষণাটুকুর অর্থ এই যে, আমি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আমার কোন বাদশাহ নেই, কোন শাসনকর্তা নেই, কোন গভর্নমেন্ট বা কোন সরকার আমি স্বীকার করি না। আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোন আইন শৃংখলা আমি মানি না, কোন বিচার আদালতের আওতার মধ্যে আমি পড়তে বাধ্য নই। কারও আদেশ আমার পক্ষে আদেশ নয়। কোন নিয়ম, শাসন, কোন প্রথাও আমি পালন করে চলতে বাধ্য নই, আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো বিশেষ কোন বৈষম্যমূলক অধিকার, কারও রাজশক্তি কারো অতি প্রাকৃতিক পবিত্রতা ও পাপ হীনতা এবং কারো স্বেচ্ছাচারমূলক উচ্চতর ক্ষমতা আমি আদৌ স্বীকার করি না। এক আল্লাহ্‌ ছাড়া বিশ্বভূবনের আর সবকিছুর বিরুদ্ধে আমি স্পষ্টভাবে বিদ্রোহী, সবকিছু থেকেই আমি স্বতন্ত্র, নির্ভীক ও বিমুখ।"[১৩]

এ নির্ভীক ঘোষণার সাথে সাথে দুনিয়া পূজারী শক্তি তৌহিদী শক্তির উপর হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনেক বাধা বিপত্তি এবং জুলুম আসবে। মক্কার বুকে প্রিয় নবী (সা)-এর সংগ্রামের সূচনায় অনুরূপ বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। যাদের উদ্দেশ্যে এ ঘোষণা ছিল তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ ঘোষণার মর্মবাণী কি। ফলে তারা শোনামাত্র বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে উঠে। ঘোষণাকারীর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে। তার এ ঘোষণা প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ইসলামী শক্তি উত্থানের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি নিজেদের বিলুপ্তির আশংকা ও মৃত্যুর ঘণ্টা ধ্বনি বাজতে দেখে। তাওহীদের বিপ্লবী বাণী ধ্বনিত হওয়ার সংগে সংগে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা এক আসন্ন বিপদের ভয়াবহ আশংকায় আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ, হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থের সংঘাত ভুলে রাসূলের মহান আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং মহানবীর আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে সচেষ্ট হলো। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সংগে যোগ দিয়েছিলেন তারা যাদের মন ছিল নিষ্কলুষ ও স্বচ্ছ। সত্য দ্বীনকে যারা গ্রহণ করেছিল জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যারা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে তথা অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে এবং মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করতে সদা প্রস্তুত। সত্যের এ আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য দৃঢ়, অটল এবং নিষ্ঠাবান যেসব মুজাহিদদের প্রয়োজন ছিলো মহানবী (সা)-এর পাশে তাদেরই এক মহা সম্মিলন ঘটেছিল।

আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী উল্লেখ করেন, "ক্রমশঃ কাফের মুশরিকদের সাথে সত্যের সৈনিকদের সংগ্রাম প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল। ফলে ইসলামী মুজাহিদীনের কারো কারো আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে গেল, কাউকেও বিতাড়িত হয়ে গৃহহারা হতে হলো। কারো আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনগণ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সামাজিকভাবে বর্জন করল। কাউকেও নির্মম প্রহার করা হলো, কেউ বা নির্বাসিত বা কারাবন্দী হলো, কেউবা প্রখর রৌদ্র তপ্তময় বালুকারাশির উপর, কেউবা হাটে বাজারে জনবহুল রাজপথে অপমানিত এবং নির্যাতিত হলো, আবার কারো মস্তক চূর্ণ করা হলো। আবার কাউকে সুন্দরী নারী, বিপুল অর্থ, রাজ সম্পদ ও আধিপত্য এবং সম্মান প্রতিপত্তি দ্বারা প্রলুব্ধ করে ইসলামী আন্দোলনের বন্দুর পথ হতে বিরত করার কুটিল ষড়যন্ত্র করা হলো। ইসলামী আন্দোলনের বীর মুজাহিদদের উপর এ ধরনের দুঃসহ বিপদের দুর্নিবার দিক প্লাবী সয়লাব

প্রয়োজনও ছিল অত্যন্ত বেশী, কারণ তা না হলে সত্যের সৈনিকদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যেতো না। অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিখাদ সোনায় পরিণত হওয়ার সুযোগও তাদের জীবনে আসতো না। সর্বোপরি এ ছাড়া সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কোনদিনই মজবুত অনমনীয় হতে পারে না। এর ক্রমিক প্রসার লাভ ও উত্তরোত্তর অগ্রগতিও সম্ভব হয় না।

বস্তুতঃ সত্যের সৈনিকগণ যখন এহেন কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন তখন তাদের অটল, অনড় ও অনমনীয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সকল প্রকার প্রলোভন, বিপদ, আপদ, আশংকা ও আতংক তাদের সংকল্পের সামনে প্রতিহত হতে দেখে সমগ্র দুনিয়া জাহান বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। ইসলামী আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ই এই সংগ্রাম ও দুঃখ-কষ্ট ভোগের প্রধান ফল এই হলো যে, দুর্বল চিত্ত ও সংকল্পে দৃঢ়তাহীন ব্যক্তিগণ বীর মুজাহিদের দলভুক্ত হতে পারলো না, ফলে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই এ আন্দোলনের পুরোধা হয়ে যোগদান করলেন এবং প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। যে কেউ এই আন্দোলনে যোগদানেচ্ছু হলে তাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। লোক নির্বাচনের এর চাইতে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না। এর ফলে নৈতিক দিক দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিগণ স্বতঃই আন্দোলন হতে বাদ পড়ে গেল।

এতদসত্ত্বেও যারা এ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলেন, তারা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পারিবারিক কিংবা জাতীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এতে যোগদান করেননি। এ দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা সব তারা অকাতরে ভোগ করেছিলেন কেবলমাত্র সত্য ও সততার জন্য, খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য; এরই জন্য তারা আহত প্রহৃত হয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী মনোবৃত্তি গড়ে উঠলো। তাদের মধ্যে খালেছ ইসলামী চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতি সৃষ্টি হলো। খোদার ভয় ও এবাদত বন্দেগীতে তাদের নিষ্ঠা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে ইসলামের বিপ্লবী ভাবধারা ও অনুপ্রেরণাও অতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেল। এক ব্যক্তি যখন নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য সাধনে মনে প্রাণে আত্মনিয়োগ করে এল সেই পথে অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা-সাধনা, সংগ্রাম, দুঃখ, বিপদ-মুসিবত, হয়রানী, আঘাত, কারাবরণ, অনাহার-অনশন, নির্বাসন প্রভৃতি দূরতিক্রমনীয় পর্যায় অতিক্রম করে সম্মুখের দিকে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হতে থাকে তখন সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের গুরুত্ব এবং এর অভ্যন্তরীণ ভাব সৌন্দর্যও তাদের হৃদয়পটে সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট হয়ে উঠে। তাদের গোটা ব্যক্তি সত্ত্বাই একটি জীবন্ত উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। এ সময় তাদের প্রতি নামাজ ফরজ করা হয়। নামাজ ফরজ করা হয় এজন্য যে, এর সাহায্যে যেন কর্ম লক্ষ্যের দিকে কর্মীদের একাগ্রতা, গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং

তাদের উদ্দেশ্য লাভের সাধনা যেন পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাদের চিন্তা ও দৃষ্টির চঞ্চলতা ও অস্থিরতা যেন নামাজের মাধ্যমে দূর হয়। এ নামাজের সাহায্যে তাদের লক্ষ্য ও মানসিক ঝোঁক যেন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়। জীবন পথে কোন ব্যাপারেই যেন তাদের দৃষ্টি মূল লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়। মনে ও মুখে মহান সত্তাকে তারা আইন রচয়িতা ও একচ্ছত্র বাদশাহ বলে স্বীকার করে নামাজের মধ্য দিয়ে বার বার তার প্রভুত্বের শপথ নেয়ায় তাদের বিশ্বাস যেন অধিকতর মজবুত হয়। এই আন্দোলনে যারা নতুন নতুন যোগ দিচ্ছিল, একদিকে এভাবে তাদের ট্রেনিং এবং নৈতিক গঠন হচ্ছিলো, অন্যদিকে এই দ্বন্দ্ব সংগ্রামের ফলে ইসলামী আন্দোলন অধিকতর সম্প্রসারিত হচ্ছিল। দুনিয়ায় মানুষ যখন নিজেদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পায় একদল মানুষ নিরন্তর প্রহার ও আঘাত সহ্য করছে, তখন এর মূল কারণ জানার জন্যে তাদের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। তারা কেন মার খাচ্ছে, কেন এত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিষ্পেষণ ভোগ করছে, এতসব নিষ্পেষণ সত্ত্বেও তাদের নিজ আদর্শ তারা কেন ত্যাগ করছে না, তা জানবার জন্য দুনিয়ার মানুষের মনে স্বতঃই ঔৎসুক্য জাগ্রত। ফলে তারা নিশ্চিত জানতে পারত যে, তারা কোন নারী, ধন-সম্পদ কিংবা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য এ নির্যাতন ভোগ করছে না। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থলাভও তাদের উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতঃ খোদার এ বান্দাগণ যে মহাসত্য লাভ করছে, দুনিয়াতে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে বলেই তাদের উপর এরূপ অমানুষিক জুলুমের পাহাড় ভেংগে পড়েছে। এ সত্য উপলব্ধি করেই তারা সে মহান সত্যের সঠিক পরিচয় লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হতো। সেই সংগে তারা এও জানতে পারতো যে, সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিপ্লবী দল সুসংঘবদ্ধ হয়ে জেগে উঠেছে। তারা যে সত্যের জন্য দুনিয়ার সব স্বার্থের উপর পদাঘাত করছে। নিজেদের জান মাল, সন্তান ও সম্পত্তি সবকিছুই অকাতরে কোরবানী করেছে। এসব জেনে ও প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়ে সকল লোক চক্ষু ম্লান হয়ে যেতো। যাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর হতে সকল পর্দা ছিন্ন হয়ে প্রকৃত সত্য তীরের মত তাদের মর্মমূলে প্রবিষ্ট হতো। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, যেসব লোককে তাদের আজন্ম অনুসৃত আভিজাত্যের গৌরব পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণ কিম্বা পার্থিব কোন স্বার্থ অন্ধকারে রেখেছে, কেবল তারাই এদিকে অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু তারা ব্যতীত তৎকালীন অন্যসব লোকই ইসলামী আন্দোলনের সাথে কোন না কোন প্রকারে জড়িত হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকটি সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকেই শেষ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল।”[১৪]

১৬. সংগঠন

এমন এক সময় ছিল যখন আধুনিক পদ্ধতির বা কাঠামোর সংগঠন ছিল না। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় সর্বত্র সংঘবদ্ধ হয়ে কিংবা কোন একটি সংগঠনের শৃংখলার কাঠামোর মধ্যে কাজ করার বা আন্দোলন করার প্রবণতা শুধু বাড়েইনি বরং ছোট বড় সব ধরনের লক্ষ্য বাস্তবায়নেই সংগঠন হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামী বিপ্লবের মত অতবড় একটি কর্ম সম্পাদনের জন্য সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আল্লাহর নবীর (সা) সংগঠনের কোন নাম ছিল না বটে কিন্তু সেটি যে একটি সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

বর্তমান বিশ্বে কমবেশী সর্বত্র ইসলামী তৎপরতা চালাতে গিয়ে সকলেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে দ্বিধা করেননি। সর্বত্র সংগঠন গড়ে তুলেই কাজ হচ্ছে। অবশ্য সংগঠন বা দল গঠন করাকে কেউ কেউ পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসরণ বলে সমালোচনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। রাজনৈতিক দল গঠনের আধুনিক প্রক্রিয়াকে যারা পাশ্চাত্যের অনুকরণ বলে সমালোচনা করেছেন সম্প্রতি তারা এর কোন বিকল্প উপস্থাপন করেননি বা করতে সক্ষম হননি। অন্যদের পাশ্চাত্য দলের অনুসরণের সমালোচনা করে তারা নিজেরাই প্রকারান্তরে তার অনুসরণ করছেন। নিজেরাও একটি শৃংখলা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তার নাম কোন দল বা পার্টি বলা হোক বা না হোক কার্যতঃ একটি সংগঠন হিসেবে তা কাজ করে। দল গঠনকে যারা পাশ্চাত্যের অনুসরণ বলে একটি তাৎক্ষণিকভাবে আকর্ষণীয় বক্তব্য উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাচ্ছেন তাদের সে সমালোচনা অন্তঃসারশূন্য। উপরন্তু তাদের মধ্যে এক ধরনের মারাত্মক ব্যক্তি পূজার প্রবণতা রয়েছে যা দ্বীনি দৃষ্টিভংগীর সম্পূর্ণ খেলাফ। মজার ব্যাপার যে কোন দল ও গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত থেকেই কিন্তু তারা আধুনিক রাজনৈতিক দল গঠন করে মাওলানা মওদূদী (র) সঠিক কাজ করেননি বলে তরুণ ও যুব মানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। সুতরাং এ ধরনের অর্থহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সমালোচকদের কথার গুরুত্ব দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

তবে ইসলামী বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী সংগঠনের অবশ্যই কতগুলো বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হতে হবে ঃ

এক. সংগঠনটির সার্বিক কর্মকাণ্ড ইসলামী বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য নিবেদিত হতে হবে। এ সংগঠন দাওয়াত সম্প্রসারণ করবে ব্যক্তিগত বা

সামষ্টিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা সংঘবদ্ধভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণে আগ্রহী হবেন তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে সাংগঠনিক নেট ওয়ার্ক। যে সংগঠন বা একটি প্রাথমিক ইউনিট গড়ে উঠবে তা বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম করবে এবং সংগ্রামী তৎপরতাকে প্রাধান্য দিবে। সংগ্রামের মাধ্যমেই বিপ্লব আসবে অন্য কোন সহজ প্রক্রিয়ায় নয়। সুতরাং সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি দাওয়াতের মাধ্যমে গড়ে উঠবে সংগঠন, আর এই সংগঠন আঞ্জাম দিবে সংগ্রাম এবং সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ পথেই অর্জিত হবে বিপ্লব। দাওয়াত-সংগঠন-সংগ্রাম-বিপ্লব এই ফর্মূলায় চলবে একটি বিপ্লব প্রত্যাশী ইসলামী সংগঠন।

দুই. ইসলামী বিপ্লব প্রত্যাশী সংগঠনের নেতৃত্বকে অবশ্যই প্রশ্নাতীতভাবে বিপ্লবী হতে হবে। শুধু মূল নেতা গতিশীল হলেই চলবে না বরং তার গোটা টীমটাই হবেন বিপ্লবী এবং গতিশীল।

তিন. সংগঠনের জনশক্তি তাদের চরিত্র ও কর্মচাঞ্চল্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের জনসমষ্টিকে গণসংগ্রামে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দিবে। সংগঠনের অধিকাংশ শক্তি, সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবে। যে কোন মূল্যে একটি টিপটপ বা সুশৃংখল সংগঠন গড়ে তোলা কঠিন নয়, কিন্তু সে সংগঠন কতটুকু বিপ্লবী সংগঠন হতে পেরেছে সেটাই বিচার্য।

চার. সংগঠনে তাকওয়া, আমানতদারী, আনুগত্য, সংশোধন, সমালোচনা পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধের এক উন্নত দ্বীনি পরিবেশ থাকতে হবে। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করা, আলাপ-আলোচনা পরামর্শ ও মতবিনিময় করার উন্মুক্ত পরিবেশের পাশাপাশি বিভিন্ন মতের সমন্বয় সাধনের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাও থাকতে হবে। অন্য সংগঠনের ন্যায় ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্ব লাভের কোন প্রতিযোগিতা যদি বিন্দুমাত্রও থাকে তা হবে আত্মঘাতী এবং বিপর্যয়ের কারণ।

❑

১৭. ক্যাডার সিসটেম

জামায়াতে ইসলামী এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিনসহ বিশ্বময় পরিচিত আন্দোলনসমূহ ক্যাডার সিসটেম গ্রহণ করেছে। অতি সম্প্রতি কেউ কেউ জোর গলায় জামায়াত ও ইখওয়ানকে ট্র্যাডিশনাল ইসলামী আন্দোলন আখ্যায়িত করেছেন এবং এসব সংগঠন বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করছেন না মর্মে প্রচারণা চালাচ্ছেন। আবার অনেকে ক্যাডার সিসটেম সম্পর্কেও সমালোচনা মুখর। এদের ধারণা জামায়াত বা ইখওয়ান কম্যুনিষ্ট আন্দোলন থেকে বিষয়টি ধার করেছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, সমালোচনাকারীদের এসব ধারণা ঠিক নয়। হুজুর (সা)-এর সংগী সাথীদেরকে বলা হয় সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবাদের মধ্যে আরেক দল ছিলেন আসহাবে সুফফা। আবার বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদেরকে দেয়া হয়েছিল বিশেষ মর্যাদা। মহানবীর (সা) জিন্দেগীতে দেখা গেছে তিনি বিশেষ একদল সাহাবীর বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ডাকতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। আবার অনেক সময় সাধারণভাবে সমাবেশ আয়োজন করে আলোচনা করতেন। অনুরূপভাবে ছিলো আনসার ও মুহাজিরগণ। অন্যদিকে মহানবী (সা)-এর মক্কায় তেরো বছর অবস্থান কালে যারা ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হন তারাই ছিলেন হিজরতের আগ পর্যন্ত নবীজীর বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাথমিক জনশক্তি। এসব আজকালকার পরিভাষায় ক্যাডার বলা না হলেও মূলতঃ তারা ক্যাডারের ভূমিকা পালন করেছেন। সুতরাং নবীজীর আন্দোলনে ক্যাডার ছিলো না এমন কথা বলা যায় না। তাছাড়া ক্যাডার পদ্ধতি লোক রিক্রুটম্যান্ট এবং প্রশিক্ষণ দানের উত্তম একটি ব্যবস্থা। এটা বৈজ্ঞানিকও বটে। মানুষের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির জন্য নয় বরং লোক তৈরী ও মানোন্নয়নের জন্য ক্যাডার ব্যবস্থা দরকার। তবে ক্যাডার কোনক্রমেই একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হওয়া উচিত নয়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে যা হয় তাহলো মূলতঃ কমরেড বা কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের ক্যাডারগণ একটি প্রিভিলেজড ক্লাস হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও ক্যাডার সিসটেমের উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। স্মরণযোগ্য যে, ক্যাডার যেন জনগণের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটি সদাকর্মচঞ্চল আদর্শ জনশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় সেদিকে সংগঠনকে সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার বলে যারা গণ্য হবেন তাদের ইসলামী গুণাবলীতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। যারা হবেন সার্বিক বিবেচনায় সমাজে অগ্রগণ্য এবং সমাজকে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতাসম্পন্ন।

কোন একটি সংগঠনের ক্যাডার সার্টিফিকেট হিসেবে বা সংশ্লিষ্ট ক্যাডারে উন্নীত হলেই সমাজ তাকে আলাদা মর্যাদা দান করবে এমনটি আশা করার পরিবর্তে ক্যাডারে উন্নীত ব্যক্তিকেই নিজ গুণাবলী ও যোগ্যতা বলে সমাজে তার মর্যাদা বা স্থান করে নিতে হবে। সমাজের আর দশজন লোকের চাইতে নৈতিক আধ্যাত্মিক সকল দিক দিয়ে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হবেন। তার বিপ্লবী চরিত্র, ত্যাগ ও কোরবানী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। তার কার্যক্রম, স্বভাব চরিত্র, লেনদেন, আচার-ব্যবহার তার নিষ্ঠা আন্তরিকতা, দেশপ্রেম, রাজনৈতিক সচেতনতা সমাজে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। সংগঠনের নাম ভাংগিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় তো দূরে থাক বরং ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার বিনিময়ে সংগঠনের তথা সংগঠনের আদর্শের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করবে।

প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার যদি সার্বিক বিবেচনায় উন্নত মান সংরক্ষণে ব্যর্থ হয় তাহলে ক্যাডারভিত্তিক আন্দোলন পিছিয়ে যেতে বা গতিহীন হতে বাধ্য। সংখ্যা যত বড়ই হোক না কেন কাঙ্ক্ষিত মানের ক্যাডার ছাড়া একটি বিপ্লবী আন্দোলন অগ্রসর হতে পারে না। স্থবিরতার জঞ্জাল যদি ক্যাডার সংগঠনের কাঁধে চেপে বসে তাহলে সেই সংগঠনের ব্যাপারে জনগণের হতাশা বেড়েই চলবে। জনগণ যদি একবার হতাশ হয় তাহলে হতাশার হাত থেকে সংগঠনটিকে বাঁচানো কঠিন হতে বাধ্য। সংগঠনের জনশক্তি যদি হতাশার শিকার হয় তাহলে ঐ সংগঠনকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াও কঠিনতর। ইসলামী বিপ্লবের জন্য ক্যাডার সংগঠন বিশেষভাবে প্রয়োজন। কিন্তু ক্যাডারের মান অবশ্যই এতটা উন্নত হতে হবে যে, ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত জনশক্তি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে জনগণের কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

ঈমানের ঘোষণা দানকারীকে মুমিন বলা হয়। আল্লাহ, রাসূল (সা), অবতীর্ণ গ্রন্থ, ফেরেস্তা, আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণকারী ব্যক্তি মুমিন হিসাবে পরিগণিত হবার পর পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখেল হওয়ার জন্য কোরআন মজিদ মুমিন ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ص ـ(البقرة : ٢٠٨)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮)

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাদেরই 'মুসলিম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মুসলিমগণের মধ্যে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলেন তাদের বলা হয়েছে মুত্তাকী। আবার মুত্তাকীদের মধ্যে যারা এহসানের নীতি অবলম্বন করে মহান আল্লাহর আরও নৈকট্য লাভ করেন তাদের 'মুহসিন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ চারটি স্তর গুণগত অবস্থান নির্দেশ করে। সুতরাং দেখা যায় আল্লাহর প্রতি ঈমানদার বান্দাদেরকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র তাদের মানের উপর ভিত্তি করে। সুতরাং যারা এ ধরনের ধারণা পোষণ করেন যে, জনশক্তি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—ক্যাডার সিষ্টেমের মাধ্যমে তাদের সে ধারণাও সঠিক নয়। একটি সংগঠন সংহত শক্তি অর্জনের জন্য তার অন্তর্ভুক্ত জনশক্তিকে মানের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস করা বা বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো কোন-ক্রমেই ইসলামের দৃষ্টিভংগীর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না।

❐

১৮. নেতৃত্ব

একটি কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের জন্য নেতৃত্বের ভূমিকা এবং অবদান অনস্বীকার্য। প্রচলিত ক্ষমতা দখলের রাজনীতির নেতৃত্ব থেকে বিপ্লবী নেতৃত্বের পার্থক্য অনেক। প্রচলিত রাজনীতিতে মোটামুটিভাবে কিছু কলাকৌশল অবলম্বন বা ঝোপ বুঝে কোপ দিতে পারলে সাফল্য লাভ সহজ হয়ে যায়। কিন্তু বিপ্লব এর চাইতেও অনেক বড় ব্যাপার এবং অনেক কঠিন ব্যাপার। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন হয় ক্ষেত্র প্রস্তুতের এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহের। প্রচলিত সমাজ কাঠামো ভেংগে যারা নতুন সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সাহসিকতা পোষণ করেন কেবলমাত্র তারাই বিপ্লবী নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

একটি নির্দিষ্ট জনপদে বা ভূখণ্ডে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করে একটি বিপ্লব সৃষ্টির জন্য যেসব উপাদান প্রয়োজন নেতৃত্ব হচ্ছে তার মধ্যে পয়লা নম্বরের উপাদান। নেতৃত্বের উদ্যোগ এবং অগ্রগামী ভূমিকা ব্যতীত কোন বিপ্লব প্রত্যাশা অর্থহীন। ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের মধ্য থেকেই কেউ না কেউ সহজাতভাবেই এ দায়িত্বে এগিয়ে আসবেন। নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে আল্লাহর দান। সব মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এক ধরনের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেন না। নেতৃত্বের গুণাবলী নিয়ে অনেকে আসেন। বিকাশ লাভের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নেতৃত্ব গড়ে উঠা নির্ভর করে। পরিস্থিতিগত কারণে নেতৃত্বের বিকাশ বা আবির্ভাব ঘটে থাকে। ঘটনা পরস্পর নেতৃত্বের ভূমিকায় যিনি দায়িত্ব পালন করেন অনেক সময় তিনি বুঝেও উঠতে পারেন না, তিনি কত বড় দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন।

ইসলামী বিপ্লবের যিনি বা যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদের অবশ্যই সার্বিক ইসলামী গুণে গুণান্বিত হতে হবে। ইসলামের তাত্ত্বিক বা একাডেমিক দিকের পড়াশুনা, জ্ঞান (ইলম) অবশ্যই এতটুকু হতে হবে যে, কোরআন হাদিস থেকে ইসলামকে সরাসরি বুঝতে পারেন। কোরআন হাদিসের সরাসরি জ্ঞান ছাড়া এতবড় দায়িত্ব পালনের কথা চিন্তা করা যায় না। মুসলিম জাহানে পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের প্রচেষ্টায় এমন অনেক লোক তৈরী হচ্ছেন যারা সরাসরি কোরআন হাদিস থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া সমসাময়িক

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রের উন্নতি এবং সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস সম্পর্কেও নেতৃত্বকে ভালোভাবে অবহিত হতে হবে।

আমানতদারী, খোদাভীতি, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ছাড়াও নেতৃত্বের জন্য তীক্ষ্ণ ইতিহাস-জ্ঞান ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি অপরিহার্য। সংগ্রাম সংঘাত এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই জনগণের মধ্য থেকে এ নেতৃত্ব বিকশিত হবে। একথা মনে করার কারণ নেই যে, গণবিচ্ছিন্নভাবে কোন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটবে।

অনেকে জননন্দিত শক্তিধর ব্যক্তিত্বকে বিপ্লবের একমাত্র উপাদান মনে করেন। পৃথিবীতে অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে থাকে। কিন্তু তারা সবাই বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারেন না। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব হঠাৎ করে জ্বলে উঠে নিভে যেতে পারে, একটি সময়ের জন্য ক্যারিজমা বা চমক সৃষ্টিও করতে পারে। স্বাভাবিক গতিতে গড়ে উঠা একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যদি কোন নেতৃত্ব গড়ে উঠে কেবলমাত্র সেই নেতৃত্বের পক্ষেই গোটা পরিস্থিতি মুকাবিলা করা সহজ। কোন সহজ বা কৃত্রিমভাবে নেতৃত্ব বিকাশ লাভ করতে পারে না। আন্দোলনকে যেমন অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করতে হয় তেমনি নেতৃত্বকে অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে আসতে হয়। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে মানুষ হিসেবে একজন অত্যন্ত উঁচুদরের মানুষ হতে হয়। মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, অকৃত্রিম সহানুভূতি না থাকলে কেউই ইসলামী আন্দোলনের বড় নেতা হতে পারে না। সাময়িকভাবে কেউ হয়তো বা খ্যাতির শীর্ষেও আরোহণ করতে পারেন এমন কি সাফল্যও লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে মানুষের হৃদয় জয় করতে একটি আদর্শিক বিপ্লব সাধন করার মত মহৎ কাজ তাঁর দ্বারা সম্পাদিত নাও হতে পারে। একজন মানুষ হিসেবেই তিনি মানুষের আস্থা লাভ করবেন এবং তিনি যে জনপদের অধিবাসী সেখানকার জনগণের আস্থা অর্জন করবেন। আদর্শিক দুশমন ও তার চরিত্র সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলবেন। আল্লাহর নবী (সা)-কে মক্কার কাফের মুশরিকরা আদর্শের কারণে বরদাশত করতে পারেনি কিন্তু সেই সমাজই তাকে আল আমিন, আস-সাদিক খেতাব দিয়েছিল। তার উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সকলেই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। তাদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রধান ত্রুটিই ছিলো বাপ-দাদার ধর্ম ও রসম-রেওয়াজ বাদ দিয়ে এক অভিনব নতুন ধর্মের কথা বলছিলেন। তারা ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্য মেনে নিলে রাজ নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। এ কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিই সর্বশক্তি দিয়ে নবীজীর (সা) নেতৃত্বের

বিরোধিতা করেছে। কিন্তু নবীজীর উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সকলেই অবহিত ছিলেন। নবীদের নিষ্পাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও কোন সাধারণ মানুষের অর্জন করার প্রশ্নই উঠে না। তবে একথা ঠিক যে, সমাজ ভালো মানুষকে ভালো মানুষ হিসেবে যে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে তা লাভ করতে হবে; ততটুকু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে।

ইসলামী নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের মানুষ, জনশক্তি ও বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় রক্ষায় অবশ্যই সাফল্যের পরিচয় দিবেন। এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা, গুণাবলী সম্পন্ন মানুষের সমাবেশ। নানা ধরনের লোককে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানোই নেতৃত্বের দক্ষতা। নেতৃত্ব অবশ্যই পক্ষপাতদুষ্ট হবেন না, একাদর্শি হবেন না। নিকটবর্তী স্তাবকদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। প্রশংসায় বিগলিত হবেন না, যত্রতত্র বা ত্বরিত মন্তব্য করবেন না, উত্তেজিত এবং অসংযত হবেন না।

সংগী সাথীদের ব্যাপারে খুবই যত্নবান হবেন। যে নেতৃত্ব তার সংগী সাথীদের মধ্য থেকে আরও অধিকতর যোগ্যতা ও প্রতিভাসম্পন্ন নেতৃত্ব বিকাশে ব্যর্থ হন তারা আসলেই ব্যর্থ। যে নেতৃত্ব বড় বট গাছের মত তার ছায়ায় আর কিছুই বাড়তে দেন না সে নেতৃত্ব ব্যর্থ। যে নেতৃত্ব যোগ্যতা সম্পন্ন উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেন না ইতিহাস তাদেরকেও ব্যর্থ বলে চিহ্নিত করবে।

আধুনিক সমাজে ইসলামী নেতৃত্বকে শুধুমাত্র সমমনা ইসলামী জনশক্তির আস্থা অর্জন করলেই চলবে না বরং বিভিন্ন সামাজিক শক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে এবং সফল সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐক্যের যোগসূত্র রচনা করতে হবে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্বকে অগ্রগামী এবং পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা ছাড়া এবং বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ছাড়াও যা বেশী প্রয়োজন তাহলো গভীর অন্তর্দৃষ্টি, আদর্শিক এবং নৈতিক দৃঢ়তা। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতাকে দার্শনিক পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে। জ্ঞান চর্চা ও সাধনায় তাকে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য সময় দিতে হবে। তাকে খুবই সক্রিয়, সচল এবং উদ্যোক্তা হতে হবে। উদ্ভূত যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে আবেগমুক্ত এবং শান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা নেতার মধ্যে থাকতে হবে। অসাধারণ সাহসিকতা ছাড়া অসাধারণ নেতৃত্ব

হয় না এবং অসাধারণ নেতৃত্ব ছাড়া বিপ্লব আসতে পারে না। আর বিপ্লব তো নিজেই অসাধারণ।

দেশময় একটি নেতৃত্বের নেটওয়ার্ক বা কাঠামো নির্বাচন ছাড়া বিপ্লবের চিন্তা করা যায় না—নেতৃত্বের সবচাইতে বড় কাজ সম্ভবতঃ এটাই। নেতার একটি বহুমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন টিম থাকাই যথেষ্ট নয়। বিপ্লব ধরে রাখার মত প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বেশ কিছু লোকের সমাবেশ আন্দোলনের হাই কমাণ্ডে সমবেত হলেই রাষ্ট্রীয়ভাবে বিপ্লব সফল করে বিপ্লব পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে মনে করার কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। জনগণ এবং নেতৃত্বের মাঝে যোগসূত্র রচনাকারী নেতৃত্বের প্রয়োজন অনেক বেশী। নেতৃত্ব তখনই শক্তি অর্জন করতে পারে যখন জনগণের সাথে যোগসূত্র রক্ষাকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লিংকম্যান তৈরী হয়। আন্দোলনের বাণী গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছে বহন করে নিয়ে যায় এ লিংকম্যান লিডারশীপ। ইসলামী আন্দোলনের এ লিংকম্যানরা যতবেশী দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব তত মজবুত হবে।

মানুষের সাথে ব্যবহার, আচার-আচরণ, চাল-চলন, লেন-দেন, উঠা-বসা, সৌজন্যতা-ভদ্রতা, আতিথেয়তা, দয়া-দানশীলতা, দরদ-ভালোবাসা, নিয়মানুবর্তিতা, অল্পে তুষ্টি, পরিশ্রম প্রিয়তা সহনশীলতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই নেতৃত্বকে অবশ্যই উন্নততর হওয়া উচিত।

কোন্ কাজটির তিনি অগ্রাধিকার দিবেন, কোন্ কাজে কতটা সময় ও শক্তি ব্যয় করবেন এ বিষয়ে নেতা নিজে সতর্ক হবেন তবে নিকটবর্তী লোকদেরও এ ব্যাপারে দায় দায়িত্ব আছে। মনে রাখতে হবে যে, কৃত্রিমভাবে কাউকে নেতৃত্বে সমাসীন করা যাবে না। বক্তৃতা-ভাষণ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জনতাকে আকৃষ্ট করার জন্য এটা ভালো। জনতাকে আকৃষ্ট করার মত ব্যক্তিত্ব হলেই যে কেউ নেতা হয়ে যেতে পারবেন এমন আশা সুদূরপরাহত। উপরের আলোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহের যদি সমন্বয় ঘটে তা হলে ভালো ধরনের একটি নেতৃত্ব বের হয়ে আসতে পারে।

নেতৃত্বের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এক বড় ধরনের উপাদান। জনগণের মধ্যে ইসলামী নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতার বড় কারণ নেতৃত্বের আধ্যাত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিক শক্তি বলতে এখানে অতি প্রাকৃতিক কোন কিছুকে বুঝানো হয়নি। ইসলাম যে তাকওয়া, পরহেজগারী এবং চরিত্র দাবী করেছে তাই, প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর পছন্দ অপছন্দের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, আদল, ইনসাফ, এহসানের

অধিকারী হওয়াই বড় আধ্যাত্মিকতা। জীবনাচার এবং বাস্তব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত হবে। যে কোন ধরনের স্বার্থচিন্তা এবং দুনিয়াদারীর উর্ধে হবেন এ নেতৃত্ব। আল্লাহর স্মরণ বা যিকির এবং আখেরাতের চিন্তায় অবশ্যই অগ্রসর কাতারের অন্তর্ভুক্ত হবেন। মানবীয় গুণাবলীর উন্নততর বিকাশ তার মধ্যে যেমনি ঘটবে তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষত্রুটি থেকেও তিনি মুক্ত থাকতে প্রয়াসী হবেন।

মুসলিম দেশগুলোতে যে রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছে তাতে সত্যিকার ইসলামী আদর্শের অনুসারীরা অনেক পেছনে পড়ে গিয়েছে। সর্বত্র যে স্বার্থপর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে সে নেতৃত্ব কায়েমী স্বার্থের প্রতীক। "ইসলামকে পুনরায় মানব জাতির নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মুসলিম উম্মাহকে তার আসল রূপ পুনরুদ্ধার করতে হবে। মুসলিম উম্মাহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব রচিত রীতিনীতির আবর্জনায় চাপা পড়ে রয়েছে। ইসলামী শিক্ষার সাথে যেসব ভ্রান্ত আইন কানুন আচার আচরণের দূরতম সম্পর্কও নেই, যেগুলোর গুরুভারে আজ মুসলিম উম্মাহ নিষ্পিষ্ট। --- এবং মানব গোষ্ঠীর নেতৃত্ব অনেক আগেই অন্যান্য আদর্শ, অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা, ভিন্ন ধরনের জীবন বিধান ও অমুসলিম জাতিগুলোর করায়ত্ব হয়ে রয়েছে।"[১৫]

মুসলিম দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। ইসলামী আদর্শের বিজয় এবং পুনরুজ্জীবনের সাথে জাতীয় নেতৃত্ব এবং বিশ্ব নেতৃত্ব গ্রহণের প্রশ্নটিও জড়িত। ইসলামী ইনকিলাবের জন্য এটি অনিবার্য।

একথা ঠিক যে, আজকের বিশ্ব নয়া নেতৃত্বের প্রত্যাশী ঃ

It is essential for mankind to have a new leadership !

The leadership of mankind by Western man is now on the decline, not because Western culture has become poor materially or because its economic and military power has become weak. The period of the Western system has come to an end primarily because it is deprived of those life-giving value which enabled it to be the leader of mankind.

It is necessary for the new leadership to preserve and develop the material fruits of the creative genius of Europe, and also to provide mankind with such high ideals and values as have so far remained undiscovered by mankind, and which will also acquaint humanity with a way of life which is

harmonious with human nature, which is positive and constructive, and which is practicable.

Islam is the only system which possesses those values and this way of life."[১৬]

অনুবাদ ঃ "মানব জাতির জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে একটি নতুন নেতৃত্বের। পাশ্চাত্য এখন মানব জাতির নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এটা এজন্য নয় যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আসলে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে বা তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এজন্য যে, যে মূল্যবোধ ও জীবনীশক্তি সঞ্চারকারী গুণাবলী তাদের মানবতার নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দিল সেসব গুণাবলী আজ আর তাদের মধ্যে নেই।

অনাগত দিনের নতুন নেতৃত্বকে ইউরোপের সৃজনশীল প্রতিভার অবদানগুলোকে সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানব জাতির সামনে এমন মহান আদর্শ ও মূল্যবোধ পেশ করতে হবে যা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যত নেতৃত্বকে মানব জাতির সামনে একটি ইতিবাচক গঠনমূলক ও বাস্তব জীবন বিধান পেশ করতে হবে যা মানব স্বভাবের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যশীল।

একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাই উল্লেখিত মূল্যবোধ ও জীবন বিধান দান করতে সক্ষম।"

বিশ্ব আজ যে নয়া নেতৃত্বের প্রত্যাশী সে নেতৃত্বকে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে হবে। এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। আজকের বিশ্ব নেতৃত্বে যারা অধিষ্ঠিত তাদের বিজ্ঞান, কারিগরী ও বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতিকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারবো না। তাই আমাদের এমন সব গুণাবলী অর্জন করতে হবে যা আধুনিক সভ্যতায় বিরল।

"To attain the leadership of mankind, we must have something to offer beside material progress, and this other quality can only be a faith and a way of life which on the one hand conserves the benefits of modern science and technology, and on the other, fulfils the basic human needs on the same level of excellence as technology has fulfilled them in the sphere of material comfort.[১৭]

অনুবাদ ঃ মানব জাতির নেতৃত্বদানের জন্য আমাদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পেশ করতে হবে। আর তা হচ্ছে মানব জীবনকে মৌলিক বিশ্বাস (ঈমান) এবং ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত একটি জীবন বিধান। এ বিধান বিস্ময়কর বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও কারিগরী বিদ্যায় সকল অবদান সংরক্ষণ করবে। সাথে সাথে মানব জাতির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের জন্য যেসব চমকপ্রদ উদ্যোগ আয়োজন করেছে, তার মান বজায় রাখতে সক্ষম হবে। আর এ বিশ্বাস (ঈমান) ও জীবন বিধান মানব সমাজে তথা মুসলিম সমাজে বাস্তব রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করবে।

❒

১৯. গণতন্ত্রের শ্লোগান ও ইসলামী বিপ্লব

গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের এক অনন্য সাধারণ ব্যবস্থা। জনগণের আস্থা যাদের উপর আছে তারাই নেতৃত্ব দেবেন এবং রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করবেন এবং জনগণের আস্থা হারালে নেতৃত্বের মর্যাদাসম্পন্ন আসনটি ছেড়ে দিয়ে জনগণের কাতারে ফিরে আসবেন। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের বা কাউকে নেতৃত্বের আসন থেকে অব্যাহতি দানের এ ব্যবস্থাকে বলা যায় গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নেতৃত্ব নির্বাচনের এ ধরনের একটি চুক্তি বা বিধান জনসমষ্টির সম্মতির ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলে শক্তি প্রয়োগ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি ছাড়াই যে প্রক্রিয়া সমাজের চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করতে পারে তাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইসলামের আবেদন বা দৃষ্টিভংগী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে এখানেই সাদৃশ্যপূর্ণ। গণতন্ত্র বলতে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনের যে ব্যাখ্যা তার সাথে ইসলামী দৃষ্টিভংগীর অনেক অমিল সত্ত্বেও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জনগণের রায় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রশ্নে একটি সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় বা মতামতের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক অবকাঠামোর সাথে এ কারণেই ইসলামী আদর্শের একটি সুসামঞ্জস্য রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কার নেতৃত্ব নির্বাচন একথার উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে যে, ইসলাম নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখে থাকে। আরোপিত বা স্বঘোষিত নেতৃত্ব ইসলাম অনুমোদন করে না। যে জনসমষ্টির জন্য নেতৃত্ব সেই জনসমষ্টির পছন্দ অপছন্দকে ইসলাম খাটো করে দেখেনি। সমাজের মধ্যে থেকেই নেতৃত্ব বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। জনগণের স্বাধীন অংশগ্রহণ ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র বা জনগণের শাসনের সাথে ইসলামের তত্ত্বগত পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে হ্যাঁ কে না এবং না কে হ্যাঁ করার যে ক্ষমতা রাখে ইসলাম তা অনুমোদন করে না। কোরআন হাদীসের নির্দেশিত মূলনীতির বাইরে কিংবা কোরআন সুন্নাহর খেলাফ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার পার্লামেন্টকে ইসলাম দেয়নি। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের পার্লামেন্ট সংখ্যা শক্তির জোরে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার রাখে। ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ কোন জিনিসকে সমাজে চালু করার পক্ষে

কোন আইন পার্লামেন্ট পাশ করতে পারবে না কিংবা এমন কোন বিলও আনতে পারবে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পার্লামেন্টে হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করতে পারবে যদিও বা পাশ্চাত্যের পার্লামেন্ট মানব রচিত সংবিধানের সীমার মধ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে। এমনকি ইসলামী পার্লামেন্টের সদস্যদের স্বাধীনভাবে বক্তব্য রাখার বা মতামত দেবার সুযোগ থাকবে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পার্লামেন্টে একজন সদস্যের জন্য এ সুযোগ প্রথাসিদ্ধ সরকারী এবং বিরোধী দলীয় রাজনীতির কারণে খুবই সীমিত। সীমারেখার বাইরে তারা কথা বলতে পারেন না।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র পার্লামেন্টকে সার্বভৌম আখ্যায়িত করে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মানে না। পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী বিধানের আওতায় ফয়সালা গ্রহণের এখতিয়ার রাখে। ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যকার উল্লেখিত পার্থক্য সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর, নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি, প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে গণতন্ত্রের দৃষ্টিভংগীকে অবহেলা করার উপায় নেই। ইসলামের সাথে এসব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যটাকে অস্বীকার করারও যৌক্তিকতা নেই। গণতন্ত্র ইসলামের বিকল্প নয়। তাই বলে গণতন্ত্রকে ইসলামের বিপরীত প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সংগঠনসমূহ নির্বাচনকে সরকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করার কিংবা নির্বাচনে অংশ নেয়ার অথবা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র মতেই জনগণের ভোটাধিকার বহাল বা স্বৈরশাসনের অবসান কল্পে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলনে শরীক হওয়ার কারণে প্রশ্ন এবং সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বলা হচ্ছে ইসলাম বাদ দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা হচ্ছে, অমুক দল তো ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের পরিবর্তে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করছে, গণতন্ত্র ইসলাম সম্মত নয়, এটাকে পরিহার করতে হবে ইত্যাদি। এ প্রচারণা মুসলিম যুব মানসে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিতে তেমন সফল না হলেও চিন্তার বিভ্রান্তি যে ঘটাচ্ছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব সরকার ব্যবস্থা চালু আছে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে ইসলামী শাসন ও সমাজ কিভাবে কায়েম হবে কিংবা জনগণের অধিকার বহালের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন কোন আন্দোলন থেকে ইসলামী কোন দল কিভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে তার কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রশ্নকর্তারা উত্থাপন করতে পারেননি। নির্বাচন ছাড়া কিভাবে জনগণের রায় প্রতিফলিত হবে তারও

কোন বিকল্প তাদের সামনে আছে বলে মনে হয় না। ন্যূনতম গণতন্ত্র যে অধিকারটুকু দিয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন করার মধ্যে কি বিচ্যুতিটা তারা দেখতে পেলেন তাও পরিষ্কার নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করার জন্য কেন গণতন্ত্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাটুকু কাজে লাগানো হবে না এ প্রশ্নের জবাবও জানা নেই। অস্ত্র বলে সমাজ পরিবর্তনের নীতি যেহেতু স্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয় বা ইসলাম এটাকে অনুমোদনও করে না সেহেতু গণতন্ত্র মতামত প্রকাশের এবং জনমত সংগঠিত করার যে সুযোগ দিয়েছে তা গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায় ? সংগঠন গড়ে তোলা ও জনমত সংগঠিত করার জন্য একজন নিরস্ত্র মানুষ কি করতে পারে ? এজন্য গণতন্ত্রের সংগ্রামকে সহায়ক হিসেবে গ্রহণের মধ্যে ভুলটা কোথায় ? গণতন্ত্রের সৌন্দর্য যাদের আকৃষ্ট করে তারা যদি গণতন্ত্রের সুবাদে ইসলামের ঐসব মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন আমার বিশ্বাস তারাও ইসলামকেই স্বাগত জানাবেন। এমনকি সমাজতন্ত্রকে মানব মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করে যারা বিভ্রান্তির সাগরে ভাসছেন তাদেরও বোধোদয় হতে পারে।

গণতন্ত্র সাধারণভাবে গৃহীত এমন একটি পরিভাষা যা বললে শৃংখলমুক্ত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই বুঝানো হয় বা গণতন্ত্র বলতে জনগণের অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগ, নেতৃত্ব নির্বাচনে অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্বশীল শাসন, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি মূল্যবোধকে ব্যাপকভাবে বুঝিয়ে থাকে। অবশ্য গণতন্ত্র শব্দটির বিভ্রান্তিকর ব্যবহারও ব্যাপক হারে চালু করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বলা যায় যে, গণতন্ত্রকে নির্বাসন দিতে হবে বা বর্জন করতে হবে এমন প্রান্তিক চিন্তার আদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই।

তবে গণতন্ত্র বলতে যেহেতু এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝায় সেহেতু ইসলামী আন্দোলনকে এ সম্পর্কে সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। শ্লোগানের অন্তরালে গণতন্ত্রের চাইতে অনেক বেশী উৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক ইসলামের খেলাফতি শাসন ব্যবস্থা যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। নিছক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত একটি দলের সাথে ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ইসলামী আন্দোলনের সুস্পষ্ট পার্থক্যটা জনগণ যেন বুঝতে পারেন এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। একটি ইসলামী দল বা আন্দোলনকে জনগণ বুঝার সাথে সাথে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাও যেন তারা বুঝতে সক্ষম হন এটার নিশ্চয়তা বিধান না করা গেলে ইসলামী আন্দোলনকেও জনগণ একটি নিছক ক্ষমতাকামী রাজনৈতিক দল ভেবে নিতে পারে। একটি ইসলামী

আন্দোলন যদি নিছক ক্ষমতারোহণকারী রাজনৈতিক দলে পরিগণিত হয় তাহলে আন্দোলনের সঠিক মেজাজ, পরিবেশ এবং আবেগ উচ্ছ্বাস এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টির আশংকা থেকে যেতে পারে। সাধারণ গণমানুষের শুভেচ্ছা, ভালোবাসা যেহেতু বিপ্লব সৃষ্টির জন্য একটি বিরাট উপাদান তাই একটি ইসলামী আন্দোলনের বক্তব্য বুঝা এবং গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাথে যাতে করে কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্নতা বা কমিউনিকেশন গ্যাপ সৃষ্টি না হয় এ ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সাময়িক লক্ষ্য হাসিলের ব্যাপারটা যাতে চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে বিবেচিত না হয়ে যায় সেদিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া মাধ্যম হতে পারে কিন্তু লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য ইসলামের ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ।

❒

২০. রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি

ইসলামী বিপ্লব সাধনে রাজনৈতিক কলা কৌশল বা স্ট্রাটেজি কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেক। একটি সাধারণ রাজনৈতিক দল যেভাবে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ইসলামী বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী কোন দলের জন্য যে তা মোটেই সমীচীন নয় ইতিমধ্যেই আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু অনেক দেশে ইসলামী সংগঠনগুলো সাধারণ রাজনৈতিক দলের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা থেকেই এ প্রশ্নের সৃষ্টি। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে এ ধরনের বিপ্লবী আন্দোলন কতটা অগ্রসর হতে পারবে এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। কেননা গণতন্ত্র নামক যে রাজনৈতিক পদ্ধতিটি আজ বহুলভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা আসলেই কতটুকু গণতান্ত্রিক তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। উপরন্তু যে নির্বাচন ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন মহলের প্রভাব বিস্তার করার বিস্তর সুবিধা রয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে যেভাবে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এর প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। উন্নত বিশ্বেও নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে ইদানিং প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সেসব দেশেও নির্বাচনকে নানাভাবে প্রভাবিত করা হয়ে থাকে। অস্ত্র ও পেশী শক্তি এবং নতুন ধরনের কারচুপি, দুর্নীতি সঠিক অর্থে জনমতের প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেশে দেশে বিরাজমান। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজিত হওয়ার দৃষ্টান্ত তৃতীয় বিশ্বে খুব একটা ঘটে না। ফলে গণতন্ত্র কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কমুনিষ্ট বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার সাথে সাথে বহুদলীয় এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও ইসলামী বিপ্লবাকাঙ্ক্ষীদের জন্য এর উপযোগিতা কতটুকু তা নিয়ে বিতর্ক বা মতভেদ অনস্বীকার্য। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য যেসব উপাদান আছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঐসব উপাদান প্রয়োগে মোটেই ভুল করবে না। ইসলামী আন্দোলন যদি ব্যাপক গণভিত্তি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে তাহলে বর্তমান ক্রটিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যেও ভালো করতে বা লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারে বলে অনেকে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে থাকেন। এর বিপরীত মত কম যুক্তিপূর্ণ নয়। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করা কঠিন।

তবে ইসলামী বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী দল বা সংগঠনকে এ বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে, এর আবেদন নিছক রাজনৈতিক দলের মত হবে না। সাধারণ মানুষ যেহেতু রাজনীতিকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার বলে গণ্য করে থাকে সেহেতু ইসলামী আন্দোলনের রণকৌশল নির্ধারণে এ বিষয়টি গভীরভাবেই বিবেচনা করতে হবে। রাজনৈতিক দলের মত সাময়িক ইস্যুতে একাত্ম হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটলে পরবর্তীতে অসুবিধা সৃষ্টির আশংকা আছে। ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন কতটুকু করা যাবে এবং কতটুকু করা উচিত এ হিসাব নিকাশ বড় কঠিন। কোন একটি ইস্যু বা বক্তব্য অতি বেশী প্রাধান্য পেয়ে যায় তখন আন্দোলনের সামগ্রিক ইসলামী চরিত্র ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে। এজন্য কোন বিশেষ সাময়িক আন্দোলনে ইসলামী আন্দোলন সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার মধ্যে সমস্যা আছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব যেহেতু গোটা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত প্রকট এবং ক্ষেত্র বিশেষে নগ্ন সেহেতু ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মকৌশলও হতে হবে খুবই সূক্ষ্ম। রাজনৈতিকভাবে এবং প্রচার প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করবে। সুতরাং এমন কোন সুযোগ তাদের দেয়া যাবে না। সর্বাবস্থায় ইসলামী আন্দোলনকে জনগণের আস্থা এবং আল্লাহর নৈকট্য এবং সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারেই যত্নবান হতে হবে বেশী।

মিশরে ইখওয়ানুল মুসলেমীনের আন্দোলন দমন করার জন্য ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইংগীতে এবং সহযোগিতায় যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। নির্যাতন-নিপীড়ন, জেল-জুলুম, মামলা-মোকদ্দমা থেকে শুরু করে আন্দোলনের নেতাকে হত্যা, মিথ্যা প্রচারণা চালানো, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও চক্রান্ত করে আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তসহ যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা হয়। নেতৃবৃন্দকে বিচারের প্রহসন করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া, দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বন্ধ করা হয়। ক্ষমতাসীন মহল ইখওয়ানের সাথে বিশ্বাস ভংগ পর্যন্ত করেছে।

অনুরূপভাবে সিরিয়া, আলজিরিয়া, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের ইসলামী সংগঠনের সাথে ক্ষমতাসীন সরকারের আচরণ থেকেও স্পষ্ট যে, ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাসীগণ একটা পর্যায় পর্যন্ত অথবা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য যতটুকু ইসলাম দরকার তার বেশী অগ্রসর হতে প্রস্তুত নয়। সিরিয়া এবং সুদানের অভিজ্ঞতাও আমাদের সামনেই রয়েছে।

ক্ষমতাসীন মহল সিরিয়ায় যে গণহত্যা চালালো, তা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়নি। কোথাও সামান্য কিছু ঘটলে পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যমে হৈ চৈ পড়ে যায় কিন্তু সিরিয়ার হামা শহরে ইসলামপন্থীদেরকে হাজারে হাজারে হত্যা করার নির্মম ঘটনা বিশ্ববাসীকে ঐভাবে জানানো হয়নি। সুদানেও ইখওয়ানকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। নেতাদের জেলে পাঠানো হয়। অবশ্য সুদানী ইখওয়ানের রাজনৈতিক কৌশলের কারণে পরবর্তী সময়ে তারা প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সক্ষম হন। যদিও ষ্ট্রাটেজি প্রশ্নে তাদের মধ্যে জাফর আল নিমেরীর শাসনকালেই মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। আন্দোলনের রাজনৈতিক কৌশল প্রশ্নে মিশরেও ইখওয়ান মতপার্থক্যের শিকার হয়। ইখওয়ানের আন্দোলন চিন্তাধারার পার্থক্য রচনায় শাসকমহলের ভূমিকাও কম নয়। কৌশলগত প্রশ্নে মালয়েশিয়ায় পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তুরস্কে সংগ্রামরতদের মাঝেও মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিগত দুই দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৌশলগত প্রশ্নে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কমবেশী পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতেও রাজনৈতিক ষ্ট্রাটেজি প্রশ্নে মতপার্থক্য এবং বিতর্ক বিদ্যমান। কোথাও এ বিতর্ক কিছুটা প্রকাশিত আবার কোথাও এ বিতর্ক আন্দোলনের অভ্যন্তরে। তবে একটি শুভ লক্ষণ যে মতভেদ এবং কৌশলগত প্রশ্নে চিন্তা-ভাবনার পার্থক্য সত্ত্বেওএকটি সহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

মৌলিক পার্থক্য যেহেতু নেই তাই কৌশলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি সমন্বয় সাধনের চিন্তা হতে পারে। পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনরত সংগঠনগুলো আজ যেসব সংকটের মুখোমুখি আমাদের মতে রাজনৈতিক ভূমিকা বা ষ্ট্রাটেজির সংকট হচ্ছে বড় সংকট। রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন কতটা অগ্রসর ভূমিকা কখন রাখবে তা নির্ধারণ করা সেখানকার নেতৃবৃন্দেরই দায়িত্ব। পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় বোধ হয় আর নেই। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টায় যেসব বাধা বিপত্তি এসেছে তা থেকে আগামী দিনের কৌশল গ্রহণের ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হয়েছে বলে মনে করা যায়। সমসাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একটি যুক্তিপূর্ণ ভিত্তির উপর কৌশল নির্ধারিত হওয়া উচিত।

এক. আন্দোলনের বক্তব্য ও ভূমিকা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

দুই. জনগণের হৃদয়ের কাছাকাছি যেতে হবে। জনগণের আস্থা, সমর্থন, ভালোবাসা অর্জন করতে হবে।

তিন. গণভিত্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক শক্তি ও সমন্বয় ঘটাতে হবে।

চার. স্বৈরাচার, যালেম শাসকদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে।

পাঁচ. বৈষম্য, বেইনসাফী, নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে।

ছয়. সংগঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠার সাথে সাথে গণ জাগরণের ও বিপ্লব সৃষ্টির লক্ষ্যকে সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সাত. আধ্যাত্মিক এবং দ্বীনি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে। প্রচলিত ধাঁচের রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থা যেন প্রাধান্য পেয়ে না যায় সেদিকটার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

আট. বিভিন্ন স্তরে জনগণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পরিচিত এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতৃত্ব বিকাশের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

নয়. কর্মতৎপরতা এবং প্রচারণার মধ্যে যুক্তিপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

দশ. আন্তর্জাতিক ইস্যুতে অত্যন্ত সূক্ষ্মতর এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত এবং নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সদাসতর্ক থাকতে হবে।

এগার. গতিশীলতাই আন্দোলনের প্রাণশক্তি, স্থবিরতার সকল পথ রুদ্ধ করে দিতে হবে।

বার. বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব এবং জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হতে হবে। নেতৃত্ব যাতে কোন অবস্থায় গণবিচ্ছিন্নতার শিকার না হন সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে।

তের. শোষিত, বঞ্চিত, অসহায়, দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ ইসলামী বিপ্লবের প্রধান শক্তি। এরা আন্দোলনে যতবেশী সংখ্যায় শরীক হবে আন্দোলনে ততবেশী গতি সঞ্চারিত হবে।

চৌদ্দ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও দ্রুত হতে হবে।

পনের. মাথাভারী ব্যবস্থা যাতে সংগঠনে প্রশ্রয় না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ষোল. পৃথিবীর সকল বিপ্লবসমূহের পিছনের সবচাইতে কার্যকর শক্তি মানুষ। সুতরাং যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ বা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার দিকেই সমধিক মনোনিবেশ করতে হবে।

বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার চাইতে মানুষ গড়া অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া .সব প্রতিষ্ঠান কার্যকর হতে পারে না বিপ্লবপূর্বকালে সে ধরনের প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলার প্রবণতা সম্পর্কে সজাগ

থাকতে হবে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে পুরো একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়ে অতঃপর বিপ্লব সাধন করতে হবে। এ ধরনের ধারণা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসাল্লামের বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

সতের. শত্রুতাকে আদর্শ দিয়ে জয় করতে হবে। চরম শত্রুর নিকটও দাওয়াত পৌছাতে হবে, দেখা সাক্ষাৎ ও সংলাপ অব্যাহত রাখতে হবে। দাওয়াত ও সংলাপে নতুন রিক্রুটমেন্ট বাড়বে, পরিচিতি ও প্রভাব বলয় সৃষ্টি শত্রুতা কমবে। বিপ্লবী আন্দোলনে মানুষের কাছে সরাসরি দাওয়াত পৌছানোর মত আর দ্বিতীয় কোন শক্তিশালী কার্যক্রম নেই। আন্দোলনে যিনি যত বড় দায়িত্বশীল তিনি দাওয়াত পৌছাবেন অনুরূপ দায়িত্বশীল পর্যায়ের লোকের নিকট এটা ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য যে সংগঠন যত বেশী অর্জন করতে পারবে তার ভূমিকা বিপ্লবের জন্য তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে।

আঠার ঃ ইসলাম সম্পর্কে এবং ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে এক ধরনের ভীতিকর প্রচারণা রয়েছে। ইসলামের সার্বজনীন আবেদন ও সর্ব শ্রেণীর মানুষের মর্যাদা, জান-মাল ও ইজ্জতের গ্যারান্টি সম্পর্কিত ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে হবে। অমুসলিমদের মর্যাদা ও অধিকার তাদের ধর্ম পালন ও চর্চার স্বাধীনতা এবং বহুমাত্রিক ও বহু ধর্ম ও বর্ণের প্রতি ইসলামের উদার ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের মধ্যে যে কোনরূপ বৈষম্য থাকবে না এ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দাওয়াত ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রচার করতে হবে। ইসলাম যে একটি মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতাকে উপহার দিয়েছে অনেক সময় সংকীর্ণভাবে ইসলামকে উপস্থাপনের জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয় বা তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ নয় বরং ইসলাম সকল মানুষের জন্য। মানুষের মহান স্রষ্টা সকল মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা দিয়েছেন—এ বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

❐

২১. ইসলামী আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা

এক. গোটা মুসলিম বিশ্বেই সাধারণভাবে ক্ষমতাসীন সরকারগুলো ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী। মুসলিম জাহানের দেশগুলো নামে স্বাধীন হলেও এসব দেশে স্বাধীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা তথা স্বাধীন সরকার গড়ে উঠতে পারেনি। অনেক মুসলিম দেশেই সরকার মুখে ইসলামের কথা বলে থাকে। ফলে ইসলামের নামে উত্থিত কোন রাজনৈতিক শক্তির বিকাশকে সেসব সরকার তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ মনে করে। কেবলমাত্র সাধারণ মুসলিম জনগণের সমর্থন পাবার উদ্দেশ্যেই যেহেতু ঐসব সরকার ইসলামকে ব্যবহার করে থাকে তাই সত্যিকারভাবে ইসলামের জাগরণকে তারা ভয় পায়। কেননা তারা এটা ভালোভাবেই জানে ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কায়েম হলে তাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তাছাড়া এসব সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে এমন সব অপকর্ম ও গণবিরোধী ভূমিকা পালন করে থাকে যার ফলে আত্মরক্ষার জন্যই তাদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা জরুরী হয়ে পড়ে।

মুসলিম জাহানে লক্ষ্য করা যায় সাধারণতঃ ইসলামী আন্দোলন যতটুকু শক্তি লাভ করলে সরকারের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার আশংকা থাকে না খুব বেশী হলে ততটুকু পর্যন্ত ক্ষমতাসীন সরকার ইসলামী আন্দোলন বরদাশত করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের সরকারগুলো ইসলামী তৎপরতা বিন্দুমাত্রও সহ্য করতে রাজী নয়। চালাক সরকারগুলো ইসলামী শক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কোন না কোন গ্রুপের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমর্থন চেষ্টা করে থাকে। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার আছে যারা সাম্রাজ্যবাদের এতটা তল্পীবাহী যে, নগ্নভাবে ইসলামী আন্দোলন ও তৎপরতার বিরোধিতা করে থাকে। সাধারণভাবে সরকার ইসলামী আন্দোলনের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করার দৃষ্টান্ত খুবই কম। কোথাও কোথাও দু' একটা সহানুভূতিশীল আচরণ দেখা গেছে। কিন্তু সেটাও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ক্ষমতাসীনদের গদি রক্ষার তাগিদেই, কোন ইসলামী বিপ্লব সংগঠনের জন্যে নয়।

ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারগুলোর অভিযোগের ধরন হলো যে এরা অর্থোডক্স, কনসারভেটিব, ফ্যানাটিক, চরমপন্থী, মৌলবাদী, সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। মজার ব্যাপার ইসলামের কথা বলে যেসব সরকার জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে থাকে তারাই অভিযোগ করে থাকে যে, ধর্ম

পবিত্র জিনিস অথচ ইসলামী দলগুলো ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট করছে। এরা মসজিদে রাজনীতি করছে অথবা ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা জিনিস ধর্মের নামে রাজনীতি করা চলবে না ইত্যাদি। অনেক মুসলিম দেশেই সরকার ইসলামী আন্দোলনকে প্রকাশ্যে প্রতিহত করছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই যেহেতু এসব দেশের সরকারগুলোকে মদদ জুগিয়ে থাকে সেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইংগিতেই মুসলিম দেশের সরকারগুলো ইসলামের উত্থানের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। মূলতঃ এসব সরকার মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। জনতার সেবা নয়, ক্ষমতার সেবাই এসব সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ আলোচনাকে যে কোন একটি মুসলিম দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে দেখলেই ব্যাপারটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দুই. যুগে যুগেই সমাজে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অব্যাহত পুঁজিবাদী শোষণ এবং একনায়কত্ব বা স্বৈরশাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে অনেক মুসলিম দেশেই একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির আশীর্বাদপুষ্ট এ অশুভ শক্তিটি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদির মাধ্যমে বেড়ে উঠে। ব্যবসায় বাণিজ্যে ও অর্থনীতির এরা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিগণিত হয়। এরা প্রায় সর্বাবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকে। তবে এদের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে এদের অনেকেই রাতারাতি অবস্থান পরিবর্তন করতে দ্বিধাবোধ করবে না। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সম্প্রসারণে সুবিধাভোগী শ্রেণীর ভূমিকা খুবই কার্যকর। কোন নীতি-নৈতিকতার এরা ধার ধারে না। যেহেতু এরা প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষপুটে বেড়ে উঠে সেহেতু ইসলামী আন্দোলনের জন্য এরা বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি করে থাকে। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এ তিন কায়েমী স্বার্থবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্গত। এ তিনটি কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীই ইসলামী আন্দোলনের চরম দুশমন।

তিন. অনেক মুসলিম দেশেই রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রতিবন্ধকতা খুবই জোরদার। তবে এর প্রকৃতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি যেখানে বেশী শক্তিশালী সেখানে রাজনৈতিক বাধা বেশী প্রকট। আবার ইসলামের সঠিক চর্চা ও অনুশীলনের অভাবে ভিন্ন মতাদর্শের প্রভাব মুসলিম সমাজে প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। তবে রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিষয়গুলো পরস্পর সম্পূরক এবং পরিষ্কার

সীমারেখা টানা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক মুসলিম দেশে পাশ্চাত্য জীবনধারা আজ এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে যাকে আদর্শিক বিপর্যয়ও বলা যেতে পারে কিংবা রাজনৈতিক বিপর্যয়ও বলা যায়। আদর্শিক বিপর্যয়ের মাধ্যমেই রাজনৈতিক বিপর্যয়ও আসে। মুসলিম দেশগুলো আজ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, স্বৈরাচার বা একনায়কতন্ত্রবাদ, রাজতন্ত্র, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বা সামন্তবাদী ব্যবস্থার শিকার। মুসলিম জাহানের সরকারগুলো এর কোনটা না কোনটা আঁকড়ে ধরে আছে রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে। এর কোনটাই ইসলামী আদর্শের পক্ষে নয়।

চার. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরী অগ্রগতির এ যুগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেমন সহজতর হয়ে উঠেছে তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে হস্তক্ষেপের সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর কোন একটি দেশও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নেটওয়ার্কের বাইরে নয়। বিশ্বময় মোড়লীপনা ও আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব থেকেই এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সবসময়ই বিশেষ নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক শক্তির বিকাশ ঘটেছে এবং প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের আজকের বিশ্বটাও তাই। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যেহেতু অদ্যাবধি কোন কার্যকর ইসলামী ঐক্যের অস্তিত্ব নেই সেহেতু কোন না কোন বিশ্ব শক্তি বা আঞ্চলিক শক্তি মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। মুসলিম রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পরাশক্তির হস্তক্ষেপ অতি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কোন মুসলিম দেশে কারা ক্ষমতায় থাকবে, কারা ক্ষমতায় আসবে এসব কিছুও পরাশক্তির ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এসব দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে পরাশক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ হস্তক্ষেপ আজ সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অসহায়ভাবে এসব দেশের জনগণ আজ তা প্রত্যক্ষ করছে। ফলে কোথায়ও জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছে না। ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই শুধু বিলম্বিত করা হচ্ছে না বরং ষড়যন্ত্রের রাজনীতি মুসলিম দেশগুলোর স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

পরাশক্তিগুলোর অন্তঃসারশূন্যতা আজ আর অস্পষ্ট নয়। হাতিয়ার আর বন্দুকের শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তিই তাদের নেই। একটি নেতিবাচক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরাশক্তিগুলোর অবস্থান ঠিক রেখেছে। ইতিবাচক শক্তির বিকাশ ঘটলে কিংবা বিশ্বময় নেতৃত্ব দিতে পারে এমন কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটলে তা বর্তমান পরাশক্তিগুলোর জন্য অনিবার্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। বিশ্ব নেতৃত্ব দেবার যাবতীয় গুণ ও শক্তি ইসলামের আছে বিধায় ইসলামী

আন্দোলনকে পরাশক্তিসমূহ বিপজ্জনক মনে করে। এসব কারণেই পরাশক্তি বা আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক শক্তি ইসলামী আন্দোলনের জন্য বাধার সৃষ্টি করছে।

পাঁচ. পরাশক্তি যেহেতু বর্তমান দুনিয়ায় নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ফলে বিশ্বময় তাদের সৃষ্ট সমস্যার কারণে মানবতা যেমন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তেমনি বিশেষ করে মুসলিম জাহানে তাদের সৃষ্ট সমস্যা ইসলামের অগ্রগতির পথে বাধা। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ উভয়ই মানুষকে ভোগবাদীর দিকেই আহ্বান জানিয়েছে। মানুষের জীবন ও যৌবনকে উপভোগ করা ছাড়া মানব জীবনের অন্য কোন মহত উদ্দেশ্য নেই। এ ভোগবাদী দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করেছে সাম্রাজ্যবাদ। খুব সহজেই এ বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। পরকালের জীবন দুনিয়ার জীবনের হিসাব-নিকাশ, ভাল মন্দ পায়ে ঠেলে দিয়ে মানুষকে নফসের গোলামে পরিণত করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং শয়তানের সাক্ষাত প্রতিভূ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাম্রাজ্যবাদ। তাই বলা যায়, ভোগবাদী সভ্যতা ইসলামের জন্য এক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

ছয়. সাম্রাজ্যবাদ গোয়েন্দা তৎপরতার জাল বিস্তার করে রেখেছে সর্বত্র। মুসলিম দেশগুলোতে এ তৎপরতা অনেক বেশী জোরদার। অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলে সাম্রাজ্যবাদ ইসলামী আন্দোলনের উপর আঘাত হানছে।

সাত. মুসলিম দেশগুলোতে স্থিতিশীল কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত সজাগ। নিজ দেশের জন্য তারা যা বলে মনে করে অন্য দেশে তা করতেও তারা রাজী নয়। অস্থিতিশীলতার মধ্যেও তাদের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ নিহিত। জনগণের রায় বা ভোট সরকার পরিবর্তনের কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি যাতে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে গড়ে না উঠে সে ব্যাপারেই পরাশক্তিগুলো যত্নবান।

আট. সামরিক শাসন, একনায়কত্ব, স্বৈরশাসন, পারিবারিক বা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকতে সহায়তা করে। দুই পরাশক্তির মধ্যে এ ক্ষেত্রে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য ছিল শুধুমাত্র বাহ্যিক শ্লোগানে। আর সেই শ্লোগানের অন্তরালে একই ধরনের নিপীড়নমূলক শাসনকে তারা বিশেষভাবে মুসলিম জাহানে উৎসাহিত করে থাকে। আঞ্চলিক

ও ভৌগলিক আধিপত্য এবং বাজার সৃষ্টির স্বার্থে এ ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের লক্ষ্যে কোন অভিন্নতা নেই।

নয়. মুসলিম সমাজকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে দ্বীন ইসলাম তথা স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং তাদের কৃষ্টি-কালচার থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সর্ববিধ কৌশল সাম্রাজ্যবাদ অবলম্বন করেছে। মুসলিম জাহানে অনৈক্য সৃষ্টি পারস্পরিক বিরোধ জাগিয়ে তোলা এবং ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত করার কূটকৌশল করে সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম সমাজকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করে দিচ্ছে।

দশ. ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দুর্নীতি বিস্তারের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগণকে অসহায় করে তোলা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আরেকটি কৌশল। অর্থনৈতিক বৈষম্য যাতে মানুষের আদর্শবোধকে পিছনে ঠেলে ফেলে দেয়, রুটি রুজির সন্ধান এবং জীবিকার্জনই যেন জনগণের প্রধান চিন্তার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয় ; দারিদ্র্যপীড়িত মুসলিম দেশগুলোতে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা হচ্ছে।

এগার. কোন দেশে যদি ইসলামী আন্দোলনের একটি সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় তাহলে সেই দেশের ইসলামী নেতৃত্বকে গণ বিচ্ছিন্ন করা, নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের সৃষ্টি করা বা নেতৃত্বকে জনগণের কাছে বিতর্কিত করে দেয়াও ইসলামের দুশমনদের বড় ধরনের কৌশল। এজন্য মিথ্যাচার, অপপ্রচার চালানোর যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য যা করা দরকার তার সবই করা হয়। এমন কি খুবই সুকৌশলে ইসলামী নেতৃত্বকে দেশের দুশমন, জনগণের দুশমন এবং স্বাধীনতা বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেহেতু দেশে দেশে জনগণ একটি নেতৃত্বকে সামনে রেখেই সংঘবদ্ধ বা সংগঠিত হয়ে থাকে তাই একবার যদি নেতৃত্বকে অকার্যকর বা অথর্ব প্রমাণ করে দেয়া সম্ভব হয় তাহলে ইসলামী আন্দোলনকে অনেক পিছিয়ে দেয়া সম্ভব। একই কারণে ইসলামী নেতৃত্ব যাতে গড়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারেও ইসলাম বিরোধী শক্তি তৎপর।

বারো. শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অনগ্রসরতা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে আরেকটি বড় ধরনের সমস্যা। নিরক্ষরতা, কুসংস্কার এবং ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ও সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ এর ফলে জনগণ অনেক সময় শত্রুমিত্র চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয় বা জনগণের পক্ষ থেকে যে সাড়া ও সহযোগিতা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন তা সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে উঠে।

তেরো. ভয়াবহ সাংস্কৃতিক আক্রমণের মাধ্যমে মুসলিম জাহানে পশ্চিমা সভ্যতা প্রভাব বিস্তারের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে যৌনতাভিত্তিক পশ্চিমা সংস্কৃতি মুসলিম দেশগুলোতেও বিকৃত সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে ধর্মপ্রাণ ঐতিহ্যবাহী জনসমষ্টিকে ভাসিয়ে নিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ভোগবাদী ও নাস্তিক্যবাদী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তারের মাধ্যমে নৈতিকতা ধ্বংস করা হচ্ছে। যে কোন মতবাদের চাইতে মুসলিম যুব সমাজের শাসনে তথাকথিত পাশ্চাত্য জীবনধারার আকর্ষণই আজ সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ। শয়তান যেভাবে নানা পথে ঈমানদার বান্দাকে বিচ্যুত করে থাকে শয়তানের অনুসারী ও বস্তুবাদের ধারক ও বাহকরাও তেমনি মানব জাতিকে শয়তানের প্রলোভনের পথে পরিচালিত করে বিপথগামী করতে সচেষ্ট।

চৌদ্দ ঃ ইসলাম সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করে, মুসলমানরা সন্ত্রাসী।

পনর ঃ এগারোর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ভয়ংকর মিডিয়া ক্যাম্পেইন হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামকে একাকার করে ফেলা হয়েছে। জেহাদ ও সন্ত্রাসকে সমার্থক করার অপপ্রয়াস চলছে। কুরআন ও মহানবী (সা) স্বয়ং সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করেছেন এমন একটি মারাত্মক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ইসলামের বদনাম করার জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে কাজ হচ্ছে। ইসলামের নাম ব্যবহার করে চরমপন্থী ও বিপথগামীদের মাঠে নামানো হয়েছে। পাশ্চাত্যের আক্রমণাত্মক প্রচারণা ইসলামকে কোণঠাসা করার জন্য যা কিছু করা দরকার তাই করছে। মিথ্যা প্রচারণা যুৎসইভাবে মুকাবিলায় ব্যর্থ মুসলিম উম্মাহ এখন শুধু চীৎকার করে বলছে যে, 'আমরা সন্ত্রাসী নই, ইসলাম শান্তির ধর্ম।' অথচ বিশ্ব ইতিহাসে ঘৃণ্যতম সন্ত্রাস ও মানবাধিকার লংঘনের জন্য যারা দায়ী, কোটি কোটি মানুষের রক্তে যাদের হাত রক্তাক্ত তারা আজ মানবাধিকারের চ্যাম্পিয়ন সেজেছে।

২২. সমস্যার মোকাবিলায় করণীয়

আলোচিত সমস্যাগুলোর মুকাবিলা করে ইসলামী বিপ্লবের পথ রচনা করাটাই আজকের প্রেক্ষাপটে সবচাইতে বড় কাজ। একথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যাদি মুকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হলে ইসলামী নেতৃত্বকে নিম্নোক্ত বিষয়ে আশু দৃষ্টি প্রদান করতে হবে ঃ

১. আন্দোলনের কর্মী বাহিনীকে তাকওয়া ও নৈতিকতার মানদণ্ডে গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলনের কর্মী বাহিনীর অস্তিত্বই তার আদর্শের পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরবে।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط -(الحجرات : ١٣)

"আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতি পরায়ণ।"-(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩)

কোরআনে বিঘোষিত এ নীতিমালাই হবে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি।

২. একটি বিপুল সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে। সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক এমন হতে হবে যাতে আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে গৃহীত কর্মসূচী সর্বত্র বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৩. বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে আন্দোলনের গণভিত্তিকে মজবুত করতে হবে।

৪. জনগণকে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনসমর্থন লাভ আন্দোলনের বিজয়ের অন্যতম শর্ত। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যে কোন ষড়যন্ত্র মুকাবিলা কেবলমাত্র জনসমর্থন দ্বারাই করা সম্ভব।

৫. স্বৈর সরকার পতনের পর কি ধরনের সরকার কায়েম হবে সে সম্পর্কে যথাসম্ভব জনমনে সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে। কোন ধরনের আপোষকামী নীতি অবলম্বন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থার প্রতীক সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় জনমত গড়ে তুলতে হবে।

৬. আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিপদ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা থাকতে হবে।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, আধুনিক বিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য লাভের পথে নানাবিধ জটিল বাধাবিপত্তি ও সমস্যাদি রয়েছে।

এসব বাধার পাহাড় এবং সমস্যার জটিলতা অতিক্রম করে আল্লাহর আইন এবং সৎলোকের শাসন তথা খেলাফতি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে ব্যাপক গণ সমর্থন অর্জন অপরিহার্য। এ কারণেই ইসলামী আন্দোলনের মূল ইস্যু বা কেন্দ্রীয় বক্তব্য থেকে কোন পার্শ্ব ইস্যু বা প্রাসংগিক ইস্যু এতটা প্রাধান্য পেতে পারে না যাতে আন্দোলনের মূল টার্গেট সম্পর্কেই জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ মূল ইস্যু এবং পার্শ্ব ইস্যুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। সাময়িক বা ছোটখাট ইস্যুতে আন্দোলনকে জড়িয়ে ফেলার বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সক্ষম নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে গণজাগরণ বা গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে পারলে নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সাফল্য লাভ করা যেতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গণচেতনা সৃষ্টি করা বা ইসলামী হুকুমত কায়েমের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সাড়া জাগানোর কঠিন কাজটি আঞ্জাম দিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ নিজে সন্ত্রাসের হোতা বা সন্ত্রাসী শক্তির সহায়তাকারী হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এনে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মাঝপথেই কিংবা যাত্রাপথেই আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করতে পারে। তাই ইসলামী বিপ্লবের দুশমনদের অজুহাত সৃষ্টির কোন সুযোগ দেয়া যাবে না।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মহান শ্লোগানকে দলীয় গণ্ডি বা সীমারেখার উর্ধে তুলে জন আকাঙ্ক্ষা বা জনগণের দাবীতে পরিণত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, জনগণের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য এ সংগ্রাম সেই জনগণ যদি তা না চায় তবে আল্লাহ তায়ালা সেই জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে দেবেন এ ধারণা মারাত্মক ভুল। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে না থাকলে কোন্ যুক্তিতে বা কেন তিনি ইসলামের ফযিলতে সে জনপদকে সিক্ত করবেন ?

আন্দোলনের সাফল্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহের প্রকাশই যথেষ্ট নয়। জনমনে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি বা সহমর্মিতাই যথেষ্ট নয়। বরং এ আন্দোলনের প্রতি জনগণের ভালোবাসা সৃষ্টি হতে হবে। আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি কৌতূহল এবং উদ্দীপনার সাথে সাথে আন্দোলনের কল্যাণ কামনায় সক্রিয় জনমত অর্থাৎ জনপ্রিয়তা অনিবার্য। বিরোধীরা হতাশ হয়ে পড়বে অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং আন্দোলনের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন শুরু করবে। এভাবে ইসলাম বিরোধী শক্তি গণবিচ্ছিন্নতার শিকার হবে। পক্ষান্তরে ইসলামী নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়তে থাকবে।

আন্দোলনকে অবশ্যই দলীয় ভাবমূর্তির উর্ধে উঠে সম্মিলিত সংগ্রাম রচনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দলীয় সংকীর্ণতার অপকারিতা থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে আন্দোলনের প্রভাব বলয় বৃদ্ধি ও ব্যপ্তি লাভ অনেকাংশে নির্ভরশীল। একটি ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্য, যে ঐক্য হবে এক কথায় জনগণের ঐক্য তা অর্জনে দলীয় স্বার্থ বিসর্জন দেবার প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতে হবে ইসলামী নেতৃত্বকে। মতপার্থক্য বা ভিন্নতা নিয়েও ঐক্য এবং সমঝোতা সৃষ্টি করতে হবে। কেননা বিভ্রান্তি বা প্রশ্ন সৃষ্টির জন্য বেশী লোকের দরকার হয় না। অনুল্লেখযোগ্য শক্তিও বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সফল হয়ে যেতে পারে। সূচনাকালের প্রেক্ষাপট এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকাশমান একটি আন্দোলনের লক্ষ্য বিচ্যুতি হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। অনুপ্রবেশ অন্তর্ঘাত, আপোষকামিতা, হঠকারিতা বা চরমপন্থা, ফ্যাসাদ বা সন্ত্রাস এ সবের ব্যাপারেই সতর্কতা অবলম্বন অতি জরুরী। আন্দোলন যত বেশী গণভিত্তি ও জনসমর্থন লাভ করতে থাকে উল্লেখিত ব্যাপারগুলো তখনই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ লক্ষণগুলো যদিও বা উদ্বেগ ও আশংকার সৃষ্টি করতে পারে তথাপি গতিশীল একটি আন্দোলনে এক পর্যায়ে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়া বিচিত্র নয়। আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে এ ব্যাপারে জাগ্রত ভূমিকা পালন করা ছাড়া বিকল্প নেই।

শয়তান যেহেতু ইসলামের চরম দুশমন সেহেতু চতুর্দিক থেকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিই তার প্রধান কাজ। শয়তান এ ক্ষেত্রে ছোটখাট মতপার্থক্য কাজে লাগানো থেকে শুরু করে আন্দোলনে ভাংগন ও বিভেদ সৃষ্টির মত ভয়ংকর ঘটনা সংঘটিত করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। নানারূপে ও বিভিন্ন পথে ইসলামী শক্তির সংহতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের এ প্রকৃতি বুঝা না বুঝার উপরই কেবলমাত্র তা প্রতিহত করার বিষয়টি নির্ভর করে। ইসলামপন্থীদের বিভেদ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি বড় ধরনের সমস্যা। কেননা সরলপ্রাণ জনগণের মধ্যে এতে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। নতুন নতুন ইসলামী সংগঠন গঠন করেও অনেক সময় ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয় এবং জনমনে আন্দোলনের পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা হয়। গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসব বাস্তব সমস্যা সতর্কতার সাথে মুকাবিলা করতে হবে। এর কোন একটির ব্যাপারে অসতর্কতা আন্দোলনের গতি পিছিয়ে দিতে পারে। অনেক মুসলিম দেশেই ইসলামী আন্দোলনের এ ধরনের বাস্তব সমস্যার মুকাবিলায় কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমান যুগের ইসলামী আন্দোলনের জন্য সমস্যাও যেমন বেশী তেমনি বিভিন্ন দেশে আন্দোলনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সতর্কতা অবলম্বন করার সুযোগও বেশী।

২৩. গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি

এক. রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব সৃষ্টি ঃ মূল নেতৃত্ব আন্দোলনের যে মহাপরিকল্পনা রচনা করবেন তাতে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য বিষয় নেতৃত্ব। তৃতীয় বিশ্বের বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি যেহেতু অনাগ্রহ বা অনাস্থা রয়েছে সেহেতু সমান্তরালভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নিতে হবে। সামাজিক নেতৃত্ব অনেক বেশী কার্যকর এবং শক্তিশালী। জনগণের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং জনমত সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব সামনে আনতে না পারলে নিছক আদর্শের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। বিভিন্ন শ্রেণীর এলিট পর্যায়ভুক্ত জনমণ্ডলী নেতৃত্বকে মেনে নিতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। জাতির নেতৃত্ব তারা গ্রহণ করতে পারেন এ আস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের সাফল্য আশা করা অসম্ভব।

দুই. গণ সংগঠন ঃ সাংগঠনিক আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূরীকরণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা একটি মজবুত সংগঠনই পারে আন্দোলনের বাহন হিসেবে ভূমিকা পালন করতে। সংগঠনের সদস্য পর্যায়ভুক্ত না হয়েও যখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক সংগঠনটিকে সামগ্রিকভাবে নিজের মনে করবেন এবং দেশের সর্বত্র গণ সংগঠন ও নেটওয়ার্ক সক্রিয়ভাবে সংগঠনের বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে পারবে কেবলমাত্র তখনই আন্দোলন জোরদার করার পদক্ষেপ নিবে।

তিন. দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ঃ দ্বীন ইসলাম যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি তাই দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সাথে আন্দোলনের গভীরতা বৃদ্ধি করার আগে গণআন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা অবাস্তব। দেশের মানুষ যেসব প্রতিষ্ঠানকে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান মনে করে সেসব প্রতিষ্ঠানকে সত্যিকার-ভাবেই অর্থাৎ নামে ও কাজেও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হতে হবে। ইসলামের বিপ্লবী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোও যাতে কাংখিত ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

চার. নারী সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ঃ মহিলা ও নারী সমাজ সামাজিক পরিবর্তনে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম। অন্য কথায় তাদের সহযোগিতা ছাড়া কোন সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন সফল হতে পারে না। আজকের দুনিয়ায় শিক্ষিত মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা তেমনি পালন করছে যেমনটি আগেও ছিল। আদিকাল থেকেই রাজনীতি ও সমাজ নিয়ন্ত্রণে মহিলাদের একটি শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। কোন আন্দোলনের জন্য সে আন্দোলনকে গণআন্দোলনের রূপ দেয়া অতি জরুরী। আর গণআন্দোলনের রূপ দিতে চাইলে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ অনিবার্য। অনেকে মনে করতে পারেন যে, এটা বাস্তব নয়। কিন্তু আসলেই বাস্তব। মহিলাদেরকে তাদের অবস্থান থেকেই এ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই নারী সমাজ ও ছাত্রীদেরকে ইসলামী আন্দোলনের পথে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ব্যাপকভাবে। ইসলামের সঠিক শিক্ষার অভাবে মহিলা ও ছাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়েছে বা হচ্ছে। বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন করে ইসলামের মহত্ব ও সৌন্দর্যের মানে তাদেরকে পরিচিত করতে হবে। জাতীয় জীবনে তাদের অবদান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা যা ইসলাম অনুমোদন করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

পাঁচ. মেহেনতি মানুষের ভূমিকা ঃ শিল্পকারখানায় খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের সমাবেশ ঘটে থাকে। সভ্যতার কারিগর হিসেবে ইসলামী আন্দোলনেও শ্রমিক সমাজ অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া ইসলাম ও মানবতার দুশমনরা দুনিয়া ব্যাপী যে শ্রেণীটিকে সবচাইতে বেশী ধোঁকা দিচ্ছে তারা হলো শ্রমিকশ্রেণী। মুসলিম দেশগুলোতেও শ্রমিকদেরকে বিদেশী তন্ত্রমন্ত্রের নামে চরম বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করা হয়েছে। ইসলামে শ্রমিকদের মর্যাদা এবং অধিকার যা নির্ধারিত রয়েছে অন্য কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তা নেই। দুঃখজনক হলো সরল প্রাণ শ্রমিকদের উল্টো ইসলামের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করছে ইসলামের দুশমনরা। গণআন্দোলনের সূচনালগ্নেই শিল্প-কারখানা ও শ্রম অংগনে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

ছয়. ছাত্র সমাজকে গঠনমূলক কাজে লাগাতে হবে ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সবচাইতে পবিত্র ও নিঃস্বার্থ মানুষের আঙিনা। ছাত্র ও তরুণদের দেশের প্রতি ভালোবাসা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও আবেগ এক অতুলনীয় শক্তি। সবচাইতে নিঃস্বার্থভাবে যারা কোন আন্দোলন বা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তারা হলো ছাত্র সমাজ। আমাদের দেশেরই শুধু নয়, বরং পৃথিবীর দেশে দেশে ছাত্রদের সংগ্রামী ভূমিকা সংশ্লিষ্ট দেশের ইতিহাসের গতি বদলে দিয়েছে। মানচিত্র পরিবর্তন করেছে এবং আদর্শের উত্থান ও পতনেও শিক্ষাঙ্গনের অসাধারণ শক্তিশালী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্র সমাজের সম্মিলিত শক্তির সামনে সামরিক বাহিনীর কামানবন্দুক পর্যন্ত অকেজো হয়ে পড়েছে। গণআন্দোলন সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হচ্ছে ছাত্র

সমাজ। এখান থেকে অংকুরিত হয়েই বিভিন্ন সময়ে বড় বড় আন্দোলন দানা বেধে উঠেছে। তবে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়েই কেবলমাত্র ছাত্রদের অংশগ্রহণ যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে অনেক দেশেই তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কোন কোন দেশে তো এমনও অনেক হতে দেখা গেছে যে, ছাত্রদের কেবলমাত্র আন্দোলনের উপকরণ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। কোন অবস্থাতেই ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে শিক্ষাঙ্গনের আন্দোলনকে ব্যবহার করা যায় না। ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলনে খুব সহজলভ্য মনে করে এবং দ্রুত ফলাফল লাভের আশায় যারা ছাত্রদের ব্যবহার করার কৌশল অবলম্বন করেছে তারা জাতিকে তেমন কিছুই দিতে পারেনি। ছাত্র সমাজকে গঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সাত. আলেম সমাজের অগ্রণী ভূমিকা ঃ দেশের আলেমগণ মুসলিম সমাজে এক বিরাট প্রভাব রাখেন। দেশের জনগণের আস্থা তাদের প্রতি এখনও অটুট। কিন্তু যে সময় থেকে আলেম সমাজ নেতৃত্ব থেকে সটকে পড়েছেন তখন থেকেই মুসলিম সমাজের বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দেশ চালানো বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বর্তমান আলেম সমাজ আমাদের কতটুকু নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এ প্রশ্নটি ছোট কোন প্রশ্ন নয়। আলেম সমাজের মধ্যে যারা বিপ্লবী এবং যাদের জ্ঞান, চরিত্র, আয়ের উৎস এবং তাকওয়া পরহেজগারী সম্পর্কে জনগণের আস্থা রয়েছে ; তারা অবশ্যই একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন। ইসলামী বিপ্লবের কাজে আলেম সমাজকে অগ্রণী ভূমিকায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপক গণসমর্থন অর্জন করা কঠিন। আলেম সমাজকে উচ্চতর ইসলামী গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

আট. ব্যাপক দাওয়াতী কার্যক্রম ঃ মূল দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে। অনেক দফা ও অনেক কথার ভীড়ে মূল কথা অনেক সময় হারিয়ে যায়। ইসলামী আন্দোলন যে মূল দাওয়াতের দিকে দেশবাসীকে আহ্বান জানাতে চায় তা জনগণকে অবহিত করার জন্য এবং জনগণের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করার জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। মানুষের ঘরে ঘরে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাপক দাওয়াতী তৎপরতা গণভিত্তি রচনার প্রধান কাজ।

১. ইসলামের তৌহিদের বিপ্লবী বাণী মৌখিকভাবে ব্যাপক প্রচার। ইসলাম চর্চা, প্রচার ও অনুশীলনের এক ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি।

ক. যার যার সামর্থ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা এবং প্রয়োজনে ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছান।

খ. সব ধরনের সভা, সমাবেশ, সেমিনার, ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য পেশ। মানুষের মধ্যে খিলাফত ও বন্দেগীর অনুভূতি সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের মত নিরক্ষরতার হার যেসব দেশে বেশী সেসব দেশে মুখে মুখে ইসলাম প্রচার অর্থাৎ মৌখিক প্রচার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। মৌখিকভাবে আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছানোর একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া আছে যা সংগঠন ব্যবস্থায় করে থাকে। আবার স্বল্পকালীন অভিযান পরিচালনা করা যেতে পারে। সপ্তাহ বা পক্ষ পালন করে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় প্রতিটি ঘরে দাওয়াত পৌঁছানো যেতে পারে। বড় বড় মাহফিল বা সমাবেশ আয়োজন করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে বক্তব্য দেয়া যেতে পারে। নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দাওয়াতী তৎপরতা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে। মসজিদগুলোকে দ্বীনি দাওয়াতের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

২. প্রচারপত্র ঃ প্রচারপত্র সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের বুঝার উপযোগী করে দুঃশাসন এবং অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার হাত থেকে জনগণের মুক্তি ও আখেরাতের নাজাতের পথ নির্দেশ করে আন্দোলনের মূল কথা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা। নানা রকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রচারপত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. পোষ্টারিং ও দেয়াল লিখন ঃ আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রচারপত্রের পাশাপাশি পোষ্টারিং ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে আন্দোলনের মূল বক্তব্যের সাথে জনগণকে পরিচিত করা এবং জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ খুবই কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। নির্দিষ্ট ও আকর্ষণীয় কতিপয় শ্লোগানের ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. বই পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার ঃ মানুষের হৃদয়ে আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি এবং মানসিক প্রস্তুতির জন্য তথা ইসলামী বিপ্লবের বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি গড়ে তোলার জন্য বই পুস্তক খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণের মধ্যে ব্যাপক বই পুস্তক পড়ানো ও পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার দিকেও নজর দিতে হবে।

৫. কোরআনের তাফসীর ও হাদীসের বাণী ঃ সংশ্লিষ্ট ভাষায় ব্যাপকভাবে পবিত্র কোরআনের তাফসির ও হাদীসের ব্যাপক চর্চা ও প্রচারের অব্যাহত অভিযান পরিচালনা। মনে রাখতে হবে কোরআন-হাদীসের শিক্ষার ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমেই কেবল মাত্র ইসলামী জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যেতে

পারে। আরবী ভাষায় যেহেতু অন্যান্য ভাষাভাষীর জনগোষ্ঠীর পক্ষে সরাসরি বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন তাই সহীভাষায় তাফসীর এবং হাদীসের ব্যাপক চর্চা সমাজে ছড়িয়ে দেয়া। এভাবেই নীরবে ইসলামী বিপ্লবের বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি সৃষ্টি করা সহজ হতে পারে।

৬. ক্যাসেট ও ভিডিও ঃ আন্দোলনের নেতৃত্বের বাণী ও বক্তব্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছে দেয়া ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ক্যাসেট ও ভিডিও সিডি শক্তিশালী ভূমিকা পালনে সক্ষম। কোন কোন পর্যায়ে এ মাধ্যম ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার সিডি ভিডিও ক্যাসেট ব্যাপকভাবে ছড়াতে হবে।

৭. সংবাদপত্র ও সাময়িকী ঃ আধুনিক বিশ্বে সংবাদপত্রের অসাধারণ ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। জনগণের দাবী দাওয়া আদায়ের আন্দোলন থেকে শুরু করে পার্শ্ব ইস্যু কিংবা সমাজ কাঠামোর বা মানচিত্রের পরিবর্তন আনয়নে সংবাদপত্রের ভূমিকা খুবই কার্যকর ও শক্তিশালী। স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিপ্লবের পটভূমি সৃষ্টি পর্যন্ত সংবাদপত্রের ভূমিকা অনবদ্য।

জনমত গঠন ছাড়া সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না। আর জনমত গঠনের জন্য সংবাদপত্র সবচাইতে শক্তিশালী আধুনিক হাতিয়ার। এমনকি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া রেডিও টেলিভিশনের ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও সংবাদপত্রের গুরুত্ব কমেনি মোটেই। দৈনিক পত্রিকার পাশাপাশি এবং অনেক ক্ষেত্রে তার চাইতেও বেশী গুরুত্বের দাবীদার সাপ্তাহিক পত্রিকার। সাপ্তাহিক পত্রিকা, সংবাদ নিবন্ধ, সংবাদ পর্যালোচনা, সংবাদ বিশ্লেষণ, সংবাদ-পটভূমিকা এবং খবরের পিছনের খবর নিয়ে আলোচনা করে জনতাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে। পত্রিকার শক্তি এতটা বেশী যে ছাপার অক্ষরে পত্রিকাগুলো দেশ জয় করতে পারে। তাছাড়া মানুষের কাছে এখনও ছাপার অক্ষরের গুরুত্ব অনেক বেশী।

প্রচার কৌশলের উপর সমাজতন্ত্রীরা অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল। ফলে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তারা একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান করে নিয়েছে। যে কারণে সমাজতন্ত্রের মত অবাস্তব একটি মতবাদ পৌনে এক শতাব্দীকাল মানুষকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম ও শক্তিশালী প্রচারনাই মূলতঃ এ অন্তঃসারশূন্য ব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। ইহুদীরাও পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রের পিছনে জোঁকের মত লেগে আছে। অর্থনীতিকে হাত করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং সংবাদপত্রে তাদের হাত শক্তিশালী রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল।

মুসলমানরা সাধারণভাবে শক্তিশালী এ হাতিয়ারটির ব্যাপারে অসচেতন। ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীগণও এ ব্যাপারে খুব একটা সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি। হয় তারা এ গুরুত্বকে হালকা করে দেখেছেন অথবা এক্ষেত্রে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। মক্তব-মাদ্রাসা-ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠার যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সংবাদপত্র গড়ে তোলার জন্য সে প্রচেষ্টাটুকুও চালানো হয়নি।

সফল গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকা যেমন শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে তেমনি আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আন্দোলনকে অনেক পিছিয়ে দিতে পারে অথবা আন্দোলনের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। প্রচার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনেক দেশেই বহু ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে প্রচার মাধ্যমের ইসলামী আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা অনেকেই প্রত্যক্ষ করছেন। ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ইসলামী আন্দোলন ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টির হেন প্রচেষ্টা নেই যা প্রচার মাধ্যমে করেনি।

প্রচার মাধ্যমের ক্রমাগত অসহযোগিতা ও বিরোধিতার কারণে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আদর্শ, দেশ ও জনগণের সেবায় সর্বস্ব ত্যাগ করার পরও যতটা সুফল পাওয়া উচিত ও জনসমর্থন পাওয়া দরকার তা পায় না। এমনকি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে জীবন দেবার পরও শাহাদাত লাভের পরও সংবাদপত্রের বিভ্রান্তিকর ভূমিকার জন্য দেশবাসীর সমবেদনা লাভ করতে সক্ষম হয় না। বৈরী সংবাদপত্র শুধু যে, কোন ঘটনা ঘটলে বিরূপ ও মিথ্যা খবরই পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হয় তা নয়। ইতিবাচক যেসব সংবাদ প্রচারিত হওয়া অতি প্রয়োজনীয় তার পরিবর্তে শুধুমাত্র নেতিবাচক খবর প্রচার করে মানুষের মনে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার করে। মিথ্যা ঘটনা, বিকৃত উক্তি প্রচার করে আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র মানুষকে ক্ষেপিয়েও তুলতে পারে।

শক্তিশালী সংগঠন পর্যন্ত বৈরি সংবাদপত্রের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। শক্তিশালী সংবাদপত্র গড়ে তোলা ছাড়া গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে যে বাধা আছে তা দূর করা সম্ভব নয়। সারা দুনিয়ায় অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সংবাদপত্রের নেতৃত্বও দিচ্ছে হয় ইসলাম বিরোধীরা না হয় ইসলামকে পছন্দ করে না এমন শক্তিগুলো। প্রতিটি দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিলে ভারসাম্য সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে। বর্তমান অবস্থাটা

একতরফা। ইসলামী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক, উগ্রবাদী ও ফ্যাসিষ্ট শক্তি হিসাবে চিত্রিত করা হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের জনসমর্থন লাভের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধা আছে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম তার মধ্যে অন্যতম। বিষয়টি সঠিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে সফল ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম সৃষ্টির কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈরী সংবাদ মাধ্যমের এভাবেই মুকাবিলা সম্ভব।

৮. গণসংযোগ অভিযান ও সফর ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য নেতৃত্বের সাথে জনগণের একটি সফল সেতুবন্ধ রচনা করা দরকার। জনগণের সাথে নেতৃত্বের যোগসূত্র যদিওবা সংগঠন কিংবা সাংগঠনিক প্রচারপত্র, বই পুস্তক তথাপি নেতৃত্বকে জনগণের খুব নিকটে পৌছতে হবে। মহানবী (সা) যেমন মানুষের ঘরে গিয়ে হাজির হতেন ঠিক তেমনি গণসংযোগ অভিযান ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান নেতৃত্বকেও পরিচালনা করতে হবে। সফর এমন হবে যাতে এলাকাবাসী বুঝতে পারেন যে অমুক ব্যক্তি আজ এখানে এসেছেন এবং তার বক্তব্য এই। কে কোথায় গেলেন, কি বললেন মানুষ জানতে পারলো না এমন সফর অর্থহীন। সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে মানুষের কাছে যুগ সমস্যা ও যুগের দাবী সামনে রেখে মানুষের সামনে দাওয়াত তুলে ধরা। দাওয়াত জনগণের মধ্যে পৌছাতে সাফল্য লাভ করার উপরই নির্ভর করছে আন্দোলনের সাফল্য। মনে রাখতে হবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মনে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে, ঈমানী চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

৯. বাস্তব কাজের মাধ্যমে সামাজিক শক্তি অর্জন ঃ শুধু বক্তৃতা ভাষণ নয়, বরং কাজের মাধ্যমে সমাজে স্থান করে নিতে হবে ইসলামী নেতৃত্বকে। মানুষ তার পরিচয় পাবে কাজের মাধ্যমে এবং বাস্তব তৎপরতার মাধ্যমে। জনগণের কল্যাণের জন্য এবং মানুষের বিপদে আপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে না পারলে বা জনগণের উৎপাত সহ্য করার মত ধৈর্য ও সহনশীলতা না থাকলে সেই নেতৃত্ব ইসলামী আন্দোলনে তেমন কোন অবদান রাখতে পারবেন না। মানুষ হৃদয় দিয়ে ভালো বাসলেই কেবলমাত্র তাদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়া সম্ভব।

২৪. গণচেতনার স্তর

ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট জনপদে জনগণের মধ্যে জাগ্রত চেতনা সৃষ্টি করা অপরিহার্য। জনগণের চেতনা বা গণচেতনার স্তর যদি পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যর্থ হয় তাহলে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা আশা করা যায় না। আন্দোলনের আহ্বান সম্পর্কে প্রশ্ন ও বিভ্রান্তি দূর করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে সজাগ না হলে জনতা আন্দোলনের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসতে পারে না। ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামী জাগরণের বিরুদ্ধে যেভাবে সম্মিলিত শক্তি ব্যবহার করছে তাতে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। অনুভূতির দিক থেকে দেশটি যদি মৃতপুরীতে পরিণত হয় এবং জাতীয় আদর্শ, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির উপর অব্যাহত হামলা সম্পর্কে জনসচেতনতা না থাকে তখন সেই জনমণ্ডলীকে সাথে নিয়ে কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না।

ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী শাসনে শোষণে মুসলিম সমাজে যে উদাসীনতা ও হতাশা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে তার ফলে সর্বোত্তম জাতি হিসেবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের বিপ্লবী ধারা থেকেই তারা আজ বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। জাতীয় আদর্শ ইসলামের প্রতিনিধিত্বের যে সুমহান দায়িত্ব মুসলিম সমাজের উপর অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে তাদের অসচেতনতাই যে জাতীয় চেতনায় উজ্জীবনের বড় অন্তরায় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঈমানী চেতনার উদ্দীপ্ত একটি জনগোষ্ঠী অনৈসলামী ব্যবস্থার মধ্যে নিষ্ক্রীয় বা নিশ্চুপ থাকতে পারে না। ইসলামী ব্যবস্থার অনুপস্থিতি তারা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারে না।

মুসলিম হিসাবে দুনিয়ায় যুদ্ধে সর্বোত্তম জাতির দায়িত্ব পালন ও বিশ্ব নেতৃত্ব দেয়ার মত উন্নততর মনোবৃত্তি না থাকলে বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ যে এক বিরাট দায়িত্ব এবং এ কাজটি যে কারো ব্যক্তিগত কাজ নয় বরং আল্লাহর কাজ এ অনুভূতির তীব্রতাই গণচেতনাকে শাণিত করবে।

❐

২৫. জনতার দাবী

আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন অন্য কথায় ইসলামী শাসন বা খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত প্রতিষ্ঠার দাবী যদি সংশ্লিষ্ট কোন দেশের জনগণের দাবীতে রূপান্তরিত না হয় তাহলে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য আশা করা যায় না। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই যেহেতু আদর্শের বক্তব্য মানুষের অর্থনৈতিক বাস্তব দাবী দাওয়ার পিছনে পড়ে গিয়েছে এবং মানুষের দুনিয়ার জীবনের সমস্যা সমাধানের বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে তাই ইসলামী শাসন কায়েমের দাবীকে জনতার দাবীতে পরিণত করতে হবে। সবাই এটা অনুভব করবেন যে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসনই জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ। এ সময় জনগণকে দাবী আদায়ে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন আদর্শের জন্য জনগণকে ত্যাগ স্বীকারে নামাতে পারলে আন্দোলন এগিয়ে যাবে। আন্দোলনের বক্তব্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও বক্তব্যে পরিণত হবে। গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবীকে গণদাবীতে রূপ দিতে হবে অবশ্যই। গণদাবীকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটবে ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যারা অতীতে সংগ্রাম করেছেন তাদের সামনে কোন পার্থিব ওয়াদা করা হয়নি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের মাত্র একটি পুরস্কারের ওয়াদাই দেয়া হয়েছে। আর সে পুরস্কারটি হলো জান্নাত। নির্ভেজালভাবে জনগণকে ইসলামের জন্য অর্থাৎ তাওহীদের বাণীতে উজ্জীবিত করা না যেতো তাহলে এত বাধার পাহাড় অতিক্রম করে আন্দোলনের কাফেলায় আসতে পারতো না।

আন্দোলনের সাফল্যের জন্য যে গণঅভ্যুত্থান আমাদের চাই তা সৃষ্টি করতে হলে জনগণের হৃদয়ে ইসলামের দাবীকে একটি জীবন্ত চেতনায় পরিণত করতে হবে। নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের ভিত্তিতে জাগ্রত জনতাই ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামের বিজয় তথা প্রতিষ্ঠার দাবীটিই জনতার দাবীতে পরিণত হবে।

❐

২৬. ইসলামী বিপ্লবের শর্ত

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ لا وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ(الانفال : ٥٣)

"এটা আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ম যে, আল্লাহ্ তায়ালা কোন নিয়ামতকে যা তিনি কোন লোক সমষ্টিকে দান করেন—ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেকে বা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছু শুনেন ও জানেন।"

–(সূরা আল আনফাল ঃ ৫৩)

অনুরূপভাবে কোরআন মজিদের আরেক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط ـ(الرعد : ١١)

"প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন না করে।"

–(সূরা আর রা'দ ঃ ১১)

সুতরাং সমাজের পরিবর্তনের জন্য বা ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে—যে জনপদে বিপ্লব সংঘটিত হবে সেখানকার জনগণের এজন্য আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে এবং এমন একটি বিপ্লবের জন্য নিজেদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জনগণ যদি বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষী না হয় কিংবা এজন্য নিজেরা তৈরী না হয় বা ভূমিকা পালন না করে তাহলে সেই জনপদে বিপ্লব হওয়া স্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায় ধরে নিতে হবে যে, ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রথম শর্তটিই পূরণ হয়নি।

ইসলামী বিপ্লবের জন্য দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে, একদল সত্যানুসন্ধানী নিবেদিত প্রাণ কর্মী। ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হকপরস্ত একদল যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর উপস্থিতি ছাড়া ইসলামী বিপ্লবের প্রত্যাশা অর্থহীন। তাই আম্বিয়ায়ে কেরাম ও নবী রসূলগণের কর্মপন্থায় লক্ষ্য করা যায় যে, তারা একদল সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরীতে অর্থাৎ মজবুত ঈমানদারদের একটি বাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ـ

"আর 'যাবুর' কিতাবে নসিহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী আমাদের নেক বান্দাগণ হবে।"–(সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)

আর এমন সকল বান্দারাই নেক বান্দা হবে যাদের সম্পর্কে কোরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○ - (الزمر : ٧٣-٧٤)

"আর যেসব লোক নিজেদের খোদার নাফরমানী হতে বিরত ছিল তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেখানে উপস্থিত হবে, জান্নাতের দরজাসমূহ আগে থেকেই উন্মুক্ত হয়ে থাকবে, তখন সেখানকার ব্যবস্থাপকরা তাদের বলবে, সালাম-শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি—খুব ভালোভাবেই ছিলে। প্রবেশ করো এতে চিরকালের জন্য। তারা আরও বলবে, শোকর সেই খোদার, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদাকে সত্য করে দেখিয়েছেন এবং তোমাদেরকে যমীনের ওয়ারিস বানিয়েছেন। এখন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা নিজেদের স্থান বানিয়ে নিতে পারি। অতএব অতি উত্তম প্রতিফল আমলকারীদের জন্য।"–(সূরা আয যুমার ঃ ৭৩-৭৪)

আরো পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (النور : ٥٥)

"তোমাদের মধ্য হতে সেইসব লোকের সাথে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে যমীনে খলীফা বানাবেন যেমনভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের এ দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের বর্তমান ভয়ভীতির অবস্থা পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক লোক।”–(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

আজকের বিশ্বে বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ব্যর্থতার পর ইসলামের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে একথা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলাম শ্রেষ্ঠ। মানব রচিত ব্যবস্থার অন্তসারশূন্যতা এবং মানব সমস্যা সমাধানে ঐসব মতবাদের ব্যর্থতা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করার পর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চাইতে ইসলামী রাষ্ট্র বিপ্লবের মাধ্যমে অসহায় বঞ্চিত পথহারা মানব সমাজকে সঠিক দিকদর্শন দেয়াই আজকের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। শুধুমাত্র মুসলমান পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীগণই নন বরং অমুসলিম বিশ্বও ইসলামের তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।

মুসলিম দেশের অনেক রাষ্ট্রনেতাও আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যবস্থাই যে শ্রেষ্ঠ একথা তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপনার যে প্রয়োজন ছিল তার কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন রাষ্ট্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র বিপ্লব ছাড়া ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকরী করাও সম্ভব নয়। তাই ইসলাম ভালো জিনিস এবং ইসলামের শিক্ষা মানুষের জন্য উপকারী বা কল্যাণকর এমন সব প্রচারণার কোন গুরুত্ব নেই যদি ইসলামী ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে মানব জাতির কল্যাণে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করা না যায়। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের শক্তি ও সম্পদ রাষ্ট্রশক্তি নিয়ন্ত্রণে বা রাষ্ট্রবিপ্লব সাধনের জন্যই ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন। কিভাবে ইসলামের রাষ্ট্রবিপ্লব ত্বরান্বিত করা যায় এ ব্যাপারেই ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের এখন বেশী তৎপর হওয়া উচিত বলে মনে হয়। জনগণ বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের জনগণ ইসলামের খেলাফতি ব্যবস্থার অধীন বাস করতে চায় এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় তারা নানাভাবে তাদের আগ্রহ উদ্দীপনার কথা জানিয়েছে। শাসক গোষ্ঠীই বরং জনগণকে তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থার বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। এমতাবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীরা যদি ইসলামী রাষ্ট্রবিপ্লব সাধনে ত্বরান্বিত পদক্ষেপ নিতে পারেন তাহলে জনগণ এ বিপ্লবের পক্ষ অবলম্বন করবেন এবং বিপ্লবকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদান রাখবেন আশা করা যায়। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, কেবলমাত্র

ক্ষমতা দখলই ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ক্ষমতা গ্রহণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়দায়িত্ব বহন করার ব্যাপারটাকে সবচাইতে বেশী প্রাধান্য দেয়াই একথার তাৎপর্য। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট কৌশল অবলম্বন ছাড়া কেবল মাত্র ইসলাম প্রচার প্রসার ও ইসলামের মহত্ব তুলে ধরাই যথেষ্ট নয় তা বুঝানোর জন্যই এর উপর সবিশেষ জোর দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।

আল্লাহ্ মুসলমানদের খেলাফত দানের যে ওয়াদা করেছেন তা কেবল তাদের জন্য যারা সত্যিকার ঈমানদার, আমল ও চরিত্রের দিক দিয়ে নেক। যারা খোদার মনোনীত দ্বীনকে অনুসরণ করে চলে এবং যারা সব রকমের শির্ক হতে পাক হয়ে এখলাসের সাথে নিয়মিতভাবে আল্লাহর বন্দী ও গোলামী করে।

আলোচিত দুটি শর্তের মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে বিপ্লবের স্বপক্ষের জনমত সংগঠিত করার জন্য যে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বাহিনীর কথা উল্লেখিত হয়েছে তাতেই নেতৃত্বের ব্যাপারটা এসে গিয়েছে। সর্বপর্যায়ে নেতৃত্ব দানের উপযোগী সুশৃংখল একদল কর্মী থাকতে হবে। যেসব দেশে জনগণ সাধারণভাবে এমন একটি বিপ্লবকে স্বাগত জানাবেন সেসব দেশের জন্য একটি গতিশীল কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। অর্থাৎ বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়ার মত একদল ঈমানদার ও যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ লোকের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সমাজের মধ্য থেকেই এমন একদল উদ্যোগী লোক তৈরী করতে হবে যারা হবেন এ বিপ্লবের চালিকা শক্তি।

❐

২৭. বিপ্লবের প্রক্রিয়া

কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামী বিপ্লবের সূচনা হবে এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সরকার চালু রয়েছে। ক্ষমতার হাত বদলই যেহেতু ইসলামী বিপ্লবের মূল কথা নয় সেহেতু উল্লেখিত শর্তসমূহ পূরণের পাশাপাশি সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে এক পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনকে ক্ষমতায় উত্তরণ করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এ পুস্তিকায় বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নিছক ক্ষমতা দখল ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য নয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনকে এক পর্যায়ে অবশ্যই ক্ষমতা নিতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে ক্ষমতায় উত্তরণ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা না থাকলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। আর চিন্তার এ বিভ্রান্তি আন্দোলনের সংহতিকেই শুধুমাত্র বিনষ্ট করে না বরং আন্দোলনে ভাংগন সৃষ্টি, বড় ধরনের মতপার্থক্য এবং পরিণতিতে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। তাছাড়াও এ নিয়ে অপরিপক্ক বিতর্কে পরিবেশ নষ্ট এবং সময় ক্ষেপন হতে বাধ্য। আন্দোলনের কর্মকৌশলেও স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দিতে পারে এবং ঝোঁক প্রবণ যে কোন সিদ্ধান্তও ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।

বর্তমান যুগে আন্দোলনের জন্য একটি বড় সুবিধাজনক দিক এটা যে, বিশ্বমানবতার মুক্তি দূত মহানবী (সা)-এর জীবনী ও কর্মপন্থা, খুলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টান্ত, উমর বিন আবদুল আজিজ (র) থেকে শুরু করে বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের ইতিহাস, ইমাম মুজতাহিদগণের সংগ্রামী সাধনার অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে রয়েছে। তাছাড়াও ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবসহ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘটনাবলীর শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত আমাদের পর্যালোচনা করে দেখার সুযোগ রয়েছে। গণতন্ত্রের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাসও আমাদের সামনে মওজুদ আছে। এমতাবস্থায় মানবতার সত্যিকার কল্যাণ সাধনের জন্য নিবেদিত একটি বিপ্লবী অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লবের বাস্তব প্রক্রিয়া কি হতে পারে বা কি প্রক্রিয়া ইসলামী আন্দোলনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারে এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাবের জন্য আমরা নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারি ঃ

১. সশস্ত্র সংগ্রাম
২. সামরিক অভ্যুত্থান
৩. ক্ষমতাসীন সরকারে যোগদান
৪. নির্বাচন
৫. গণআন্দোলন

সশস্ত্র সংগ্রাম

সশস্ত্র সংগ্রামের ধারণাটা মূলত সমাজতন্ত্রীদের বা কম্যুনিষ্টদের। অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল, রাজ্য দখল আগের যামানায় রাজা বাদশাহ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর প্রাক্টিস ছিল। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাত করে কোন নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারাটা সমাজতন্ত্রের অবদান। সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে সরকারের পতন ঘটানো হয়তোবা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে যে মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এমন দাবী বোধ হয় যুক্তিসংগত হবে না। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় অস্ত্রধারী একটি মহল ক্ষমতায় আসতে হয়তোবা সক্ষমও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জনগণের মাথার উপর তরবারী ঝুলিয়ে রেখে কোন বিপ্লব সাধন করে জনগণের কোন কল্যাণ করার কথা চিন্তা করা অর্থহীন। স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা মুক্তি আন্দোলনের জন্য সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রাম বা গণযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। কিন্তু তাতেই যে অর্থবহ কোন সমাজ পরিবর্তন বা আদর্শের বিপ্লব ঘটে যাবে এমন গ্যারান্টি দেয়া যায় না।

সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটিয়ে ইসলামী সরকার কায়েমের চিন্তা কারো মধ্যে দেখা দেয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, তরবারী, কামান, বন্দুকের জোরে কোন জনপদে ইসলাম কায়েম করে দেয়া যায় না। ইসলামী বিপ্লবের জন্য মানসিক বিপ্লব সাধন এক অনিবার্য প্রাথমিক অধ্যায়। কিছু লোক কামান বন্দুক ও গোলা বারুদ হাতে নিয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলবেন এটিই যদি ইসলামী বিপ্লবের কর্মপন্থা হতো তাহলে ইসলামের মহান আল্লাহর রাসূল (সা) তাই করতেন। বিপ্লবকে সুসংহত করার জন্য কিংবা প্রতিবিপ্লবী শক্তির দুর্গ চূর্ণ করে দেয়ার জন্য নবীজী (সা) ও সাহাবায়ে কেরামকে এক পর্যায়ে অস্ত্র হাতে নিতে হয়েছে। কিন্তু তা বিপ্লবের সূচনাকালে কিংবা বিপ্লবকালে নয় বরং বিপ্লোবোত্তর পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ন্যায়সংগতভাবেই তা করতে হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাজত ও নিরাপত্তার জন্য তা ছিল অনিবার্য। সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইসলাম কায়েমের চিন্তা মূলতঃ একটি হঠকারী চিন্তা। কেননা ইসলামী আদর্শ তা

অনুমোদন করে না। সরকার গঠন, কর্তৃত্ব বা কমাণ্ড প্রতিষ্ঠার পূর্বে অস্ত্রের ব্যবহার ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না। পরিস্থিতির চাপে অস্ত্র হাতে নেয়ার ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে লক্ষ্য করা গিয়েছে। অস্ত্রের এ চর্চার কারণে সেখানকার ইসলামী আন্দোলনে ব্যাপক মতভেদ ও গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলেমীনের মত সংগঠন—যে সংগঠন মিশর, সিরিয়া, সুদান, জর্দানসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে এক দারুণ আশাবাদের সঞ্চার করেছিল সেই সংগঠনেও অস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্নে সংকট সৃষ্টি হয়। অবশ্য সেখানকার বিশেষ করে সিরিয়ার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আর মিশরের অস্ত্রের ব্যবহারটা প্রশিক্ষণ এবং একটি বিশেষ গ্রুপ পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল। তথাপি ঠুনকো অযুহাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তায় ক্ষমতাসীন সরকার ইখওয়ানের উপর চড়াও হয় এবং এ শতাব্দীর সাড়া জাগানো অন্যতম এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। সাম্রাজ্যবাদ অবশ্য অস্ত্র ব্যবহার না করলেও অন্য যে কোন অযুহাত সৃষ্টি করে ইসলামী আন্দোলনকে খতম করতে পারে। কিন্তু সশস্ত্র এবং সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে না সে অবস্থায়। ইখওয়ানের অস্ত্রের প্রশ্নে সামান্য সংশ্লিষ্টতাকে অবলম্বন করে ইখওয়ানের উপর যেভাবে আঘাত হানা সম্ভব হয়েছিল তা অন্যদিক থেকেও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এ ঘটনার ফলে আন্দোলনের অভ্যন্তরেও সুস্পষ্ট মতপার্থক্য এবং চিন্তার অনৈক্য সৃষ্টি হয়। এর খেসারত মধ্যপ্রাচ্যের জনগণকে এখনও দিতে হচ্ছে। ইখওয়ানের পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন আযাদী লাভ থেকে শুরু করে প্রায় ৭০ বছর যাবত সংগ্রাম চালিয়েও মিশরে ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে একটি জেনারেশনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। যদিও ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই। তবে কোন সময়সীমা যে নেই এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্বই আমাদের দায়িত্ব একথা কম লোকেই বুঝে থাকে। অন্যথায় সকলেই আন্দোলনের একটি সাফল্য বা পূর্ণতা দেখতে চায়। মিশরে এত শক্তি অর্জন করার পরও বিপ্লব সংঘটনে সাফল্য লাভ করেনি। ফলে দুনিয়াবী সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যদিও বা আদর্শিক বিপ্লবের জন্য ষাট সত্তর বছর সময় কোন সময় নয়। অনেকে মনে করেন যে, সশস্ত্র একটি গ্রুপ গঠনে উৎসাহ যুগিয়ে ইখওয়ান ভুল করেছিল। এ গোপন গ্রুপের তৎপরতার কারণে বাহ্যিক অসুবিধার সাথে সাথে আন্দোলন আভ্যন্তরীণভাবেও সংকটের সম্মুখীন হয়। এ কারণেই আন্দোলনের সাফল্যও

পিছিয়ে যায়। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। অবশ্য এ সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন যে, ইখওয়ানের জন্য কোনটা সঠিক ছিল আর কোনটা সঠিক ছিল না। এ আন্দোলনকে আমরা যতটা জানতে পেরেছি তাতে এই একটি মাত্র দিক ছাড়া বড় ধরনের অন্য কোন ত্রুটি আমাদের নজরে পড়ে না। কর্মী বাহিনীর ত্যাগ-তিতিক্ষা নিষ্ঠা-আদর্শবাদিতা, যোগ্যতা, দক্ষতা সোনালী অক্ষরে লিখিত থাকবে। নেতৃত্বের সাহসিকতা, বলিষ্ঠতা এবং কোরবানী আধুনিক বিশ্বের মানুষদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তথাপি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্ত ইখওয়ানের আন্দোলনের পথে বড় বাধা হলেও ক্ষমতা উত্তরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচিত চিন্তাধারাও যে এ আন্দোলনের সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে একথা অনেকটা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে।

সাম্প্রতিক বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উজ্জীবিতদের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস কমবেশী আমাদের সামনেই আছে। সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান, শ্রেণী শত্রু খতম করার শ্লোগান এবং অস্ত্রের সাহায্যে শত্রু খতম করে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ কায়েমের মন্ত্রে বিশ্বের দিকে দিকে যুব সমাজ এক সময় আলোড়িত হয়েছে। আমাদের উপমহাদেশে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিয়ে কত অসংখ্য নেতা, সংগঠক এবং প্রতিভাবান যুবকদের এক বিশাল অংশ যেভাবে ঝুঁকে পড়েছিল এবং পরবর্তীকালে যে মর্মান্তিক ও দুঃখজনক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তাতে সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ক্ষমতা পরিবর্তন, বিপ্লব সাধন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল ও জনগণের কল্যাণের জন্য এ পথ কোন সুস্থ পথ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। রাশিয়া থেকে অস্ত্রপাতি, সোনাদানা, টাকা-পয়সা ভারতে এনে এখানে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদী সূর্যসেনদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের হঠকারী রাজনীতি আমাদের সামনেই আছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলা, গোপন সংগঠনের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে কর্মীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দান ও গলাকাটা রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ সকল প্রচেষ্টার যোগফল হয়েছে অবশেষে শূন্য। কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এ উপমহাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন তো দূরের কথা সময়ের পরিক্রমণে গণবিচ্ছিন্নতারই শিকার হয়েছে। উপরন্তু শ্রেণী শত্রু নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে নানা বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে শুধু এ উপমহাদেশেই নয় বিশ্বব্যাপী বিভ্রান্তির ফলে অসংখ্য উপদল ও গ্রুপে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিভক্ত হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদী কায়দায় আন্দোলনে সাফল্য আনায় যারা বিশ্বাসী তারাও নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে

যায়। সশস্ত্র সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদীদের এ বিপর্যয় থেকে এটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অস্ত্রের বলে কিংবা সশস্ত্র পন্থায় মানব কল্যাণের জন্য কোন বিপ্লব উপহার দেয়া তো দূরের কথা সশস্ত্র সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদের চক্কর থেকে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের উদ্ধার পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও কম্যুনিষ্টদের কোন কোন গ্রুপ বা দল সশস্ত্র লাইন পরিহার করার কথা ঘোষণা করেছে তথাপি জনগণের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী গণবাহিনী গঠন করে চমক সৃষ্টির মাধ্যমে বিপ্লবের পদক্ষেপ নিয়েও তারা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াসীদেরকে কম্যুনিষ্টদের একটি বিরাট অংশও আজ অতিবিপ্লবী হঠকারিতা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিকট অতীতে বাংলাদেশেও সশস্ত্র সংগ্রাম ও শ্রেণী সংঘাতের মাধ্যমে যারা রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়াস চালিয়েছে তারাও এখন সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে ইস্তফা দিয়েছে। কোন কোন সশস্ত্র পার্টি আজ কেবল মাত্র সশস্ত্র ডাকাত দলে পরিণত হয়েছে। গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস, ডাকাতি এবং লুটপাটই এখন তাদের কার্যক্রম। পশ্চিম বংগেও নক্সাল পন্থী বলে কথিত সশস্ত্র সংগ্রামীরা আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। একথা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লবের রঙ্গীন স্বপ্নের মোহ তারা বাস্তবতার নিরিখেই ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। গলাকাটা, সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পথ পরিহার করে তথাকথিত বিপ্লবী এসব বিভ্রান্ত নেতারা নিজেরাই অতীতের ভুল সংশোধন করে স্বাভাবিক রাজনীতিতে ফিরে আসছেন। বাংলাদেশে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সেনাবাহিনীর একটি অংশের সাথে যোগসাজশ করে শ্রেণী সংগ্রাম তথা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠন করে যে হঠকারী কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল তার পরিণতি এ দেশের রাজনীতি সচেতন মানুষ অবহিত আছেন। সশস্ত্র বিপ্লবের যে রঙ্গীন স্বপ্ন তারা দেখেছিল তা শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি দলটি ভেঙ্গে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। দলের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিগণ এখন নানা ভাগে বিভক্ত ও কর্মীদের বিশাল অংশ হতাশ। দলের অন্যতম প্রাণ পুরুষ শেষ জীবনে ইসলামী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন কিন্তু তার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিককে হারিয়েছে। প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় যুব রাজনৈতিক কর্মীদের সমাবেশ ঘটেছিল জাসদে কিন্তু হঠকারী ও অপরিপক্ক পদক্ষেপ এবং রাতারাতি বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলার নীল স্বপ্ন জাসদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং হতাশার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করেছে অনেক মেধাবী এবং সাহসী তরুণদের।

সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর পরই তদানীন্তন মুজিব সরকারের জন্য একটি হুমকির সৃষ্টি করেছিল। ছাত্র-যুবকদের মাঝে একটি নেটওয়ার্ক নানা ধরনের সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পরিচালনা, থানা লুট ও ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। হক-তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট) ও সাম্যবাদী দলের বিভিন্ন গ্রুপও হঠকারী কর্মকাণ্ড চালিয়ে গণবিচ্ছিন্ন খুনী ও ডাকাত দলে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য মোহাম্মদ তোয়াহা সহ বেশ কিছু নেতা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে গণতান্ত্রিক রাজনীতির লাইন গ্রহণ করেছিলেন। তাদের এই ভুল সংশোধন প্রমাণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি স্বাভাবিক বা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বেলা অনেক গড়িয়ে গিয়েছে। তারা যতক্ষণে তাদের ভুল অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন ততক্ষণে বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট অনেক বদলে গিয়েছে। কম্যুনিষ্টদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বী রাশিয়া নিজেই ঝুঁকে পড়েছে সেই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী দুনিয়ার দিকে। সুতরাং একথা আজ দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আদর্শ বা বিপ্লবের কোন ভবিষ্যত আর অবশিষ্ট নেই।

আমাদের এ স্বল্প পরিসর আলোচনায় সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যর্থতার গোটা চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে একথা সত্য যে, সশস্ত্র সংগ্রাম মানব কল্যাণের কোন পথ হতে যে পারে না তা আজ সপ্রমাণিত। তাছাড়াও অস্ত্রের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। কোন গ্রুপ বা গোষ্ঠীর হাতে যখন অস্ত্র দেয়া হবে তাদের চরিত্র আচরণে তার প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। ফেতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য অস্ত্রই যথেষ্ট। ইসলামী আন্দোলনের পরিসরেও তাই অস্ত্রের চিন্তা করা অজ্ঞতা এবং হঠকারিতারই ফসল। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের চিন্তা করার কোন অবকাশই নেই।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কোন দল ও প্রতিপক্ষের ছাত্র ও যুবক কর্মীদের মাঝে অস্ত্র ব্যবহারের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে তার মোকাবিলায় কেউ কেউ অস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, অস্ত্রের জবাব বিক্ষিপ্তভাবে অস্ত্র দিয়ে দিতে গেলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বাধ্য। বিশেষ করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ও বিদেশী শক্তি এবং ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী শক্তিসমূহ এ রকম পরিস্থিতিতে বিশেষ গ্রুপ লালনের প্রক্রিয়া হিসাবে অস্ত্রের ব্যবহার করে থাকে। এর মোকাবিলা জনগণকে সংগঠিত করার মাধ্যমেই করতে হবে, অস্ত্রের মাধ্যমে নয়। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেই

এর জবাব দেয়া সম্ভব। রাজনৈতিকভাবে হতাশ এবং জনগণকে ভয় পায় এমন সব গ্রুপ অস্ত্র প্রয়োগে সাময়িক রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায়। ধৈর্য ও হিকমতের সাথে ঐ অস্ত্রবাজদের মুখোশ উন্মোচিত করতে হবে। কেননা সন্ত্রাসবাদী শক্তি চায় অস্ত্রের খেলায় তারা যদি ইসলামী সংগঠনকে মাঠে নামাতে পারে তাহলে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের মাধ্যমে সহজেই ইসলামী আন্দোলনকে ঘায়েল করা সম্ভব হবে। ঐসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজ দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করলেও ছোট ছোট দেশগুলোতে নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে বা ইসলামী আন্দোলনের তৎপরতা স্তব্ধ করে দেয়ার স্বার্থে এমন ধরনের কূট কৌশল গ্রহণ করে থাকে। যেমন আমাদের দেশেও কোন কোন পাশ্চাত্যপন্থী, ভারতপন্থী বা কম্যুনিষ্ট পন্থী অনেক সংগঠন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করছে। অস্ত্রবাজ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেই এর জবাব দিতে হবে।

সামরিক অভ্যুত্থান

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। এ নিবন্ধ রচনা কালেও কম করে হলেও ৬০টির মত দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক শাসন কিংবা সেনাবাহিনী রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ, ক্ষমতার কোন্দল ইত্যাদি নানা কারণে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে থাকে। শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল কিংবা রাজনীতিকদের ব্যর্থতার কারণেও সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ অনাকাঙ্ক্ষিত বিবেচনা করা হলেও কিংবা এটাকে পেছন দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল বলে গণ্য করা সত্ত্বেও সামরিক শাসন বা সামরিক অভ্যুত্থান ক্ষমতা দখলের একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে দেশেই ক্ষমতা দখল করা হোক না কেন এ শাসনের বৈধতা বা লেজিটিমেসির সমস্যাটি থেকেই যায়। এটা হচ্ছে জনগণের উপর এক ধরনের চেপে বসা শাসন। কোন কোন ক্ষেত্রে সামরিক শাসন জনগণ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অভিনন্দিত হওয়ার ঘটনাও বিচিত্র নয়। কিন্তু সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার চাইতে দেশ রক্ষা বা জাতীয় প্রতিরক্ষার সাথেই বেশী সংশ্লিষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নির্দেশ জানার পদ্ধতিটাই ভিন্ন ধাচের তাই এক পর্যায়ে গিয়ে আশা

ভংগের কারণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক অভ্যুত্থান উত্তর শাসন একনায়কত্ব বা ডিক্টেটরশিপের দিকে মোড় নিয়ে থাকে।

সামরিক শাসন থেকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বা জনগণের রায় নিয়ে সরকার বদলের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণ খুবই কঠিন হয়ে থাকে। অনেক সময় স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ এবং স্থিতিশীলতা আনয়ন অর্থাৎ রাজনৈতিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হয়।

একবার কোন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটলে চক্রাকারে এর পুনরাবৃত্তিও ঘটতে থাকে। সামরিক শাসনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বলয় থেকে বের হয়ে এসে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির কাঠামো বিকশিত হতে বাধাগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবনে অনেক সময়ই ভুল করা হয়ে থাকে। নতুন শ্লোগান এবং সরকারের যে বক্তব্য ক্ষমতা দখলের স্বার্থে জনগণের সামনে উত্থাপন করা হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উপরন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যারা ক্ষমতা দখল করে থাকেন তারা এক পর্যায়ে রাজনীতিকদের সহযোগিতা গ্রহণে বাধ্য হন। আর এ সুযোগে দুর্নীতিপরায়ণ এবং ক্ষমতা লিপ্সু রাজনীতিকদের একটি অংশ এগিয়ে আসে। তাছাড়াও বেসামরিক আমলারা যারা দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রাখেন তাদের সহযোগিতা সামরিক বাহিনীকে নিতে হয়। সামরিক শাসনের স্থায়িত্বের জন্য বেসামরিক আমলাদের সহযোগিতা জরুরী। ফলে সামরিক অভ্যুত্থানকালে উচ্চাভিলাষী সামরিক জান্তা, বেসামরিক আমলাচক্র এবং ক্ষমতা লিপ্সু রাজনীতিক এই তিন শক্তির অশুভ আঁতাতের শাসন চলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয় এবং দেশে এক নতুন ধরনের লুণ্ঠন চলতে থাকে এবং দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম হয়।

সামরিক সরকার জনগণের কাছে কোন ব্যাপারে জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। সরকার পরিচালনা থেকে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অন্য কথায় সরকার গণবিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে যায়। কালক্রমে এক ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতা পুঁঞ্জিভূত হয় এবং ক্ষমতাসীনরা সরকার পরিচালনা নয় বরং তারা এক ধরনের রাজত্ব পরিচালনা করেন। এ রাজত্বে অন্যরা সব হুকুমের পুতুল। যাদের মন্ত্রী হিসাবে নিয়োজিত করা হয় তাদের কোন স্থায়িত্ব থাকে না। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার রদবদল করে সহযোগীদের তটস্থ রাখা হয়ে থাকে। এটা এক ধরনের কৌশল। সামরিক অভ্যুত্থানে যারা ক্ষমতায় আসেন আরেকটি পাল্টা অভ্যুত্থানে তাদের পতনের আশংকা বিদ্যমান থাকে।

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় এবং এ নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত সরকার এসব কারণেই স্থিতিহীনতায় ভোগে। মোদ্দাকথা সামরিক সরকার দেশকে কোন স্থিতিশীল রাজনীতি উপহার দিতে পারে না। ফলে এ ধরনের সরকারের পক্ষে কোন আদর্শিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানের সামরিক সরকারের শরীয়তী শাসন কায়েমের একটি পরীক্ষা সাম্প্রতিকালে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে পাকিস্তানের সামরিক নেতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক নিজে ইসলামী বিধি বিধান কায়েমের ব্যাপারে বড় বেশী সোচ্চার ছিলেন। যে কোন মূল্যে ক্ষমতা দখল করে ইসলাম কায়েমের তত্ত্ব যেহেতু ইসলাম সম্মত নয় সেহেতু জনগণের নিকট সামরিক সরকারের ইসলামী কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য হয় না। বন্দুকের জোরে কোন সেনানায়ক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব করে ফরমান জারী করলেন আর ইসলামী বিপ্লব হয়ে গেল এ ধারণা ভুল। বিভিন্ন দেশের সামরিক শাসন বা সামরিক অভ্যুত্থান পরবর্তীকালের সরকারের কর্মকাণ্ড থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আইনগত বৈধতা না থাকার কারণে সামরিক সরকার জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। জনগণের আন্তরিক আস্থা অর্জন ছাড়া ইসলামী বিপ্লব প্রত্যাশা করা যায় না। যারা অবৈধভাবে জনগণের মাথার উপর চেপে বসলেন তারা ইসলাম কায়েমের মত একটি মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন জনগণ এটা বিশ্বাস করতে পারে না। জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণ ছাড়া কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই সফল হতে পারে না। অধিকন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেও জোরপূর্বক বা অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করাটা সম্পূর্ণ অবৈধ। যাদের নিজেদেরই ক্ষমতায় থাকার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আছে তারা কি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মত মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন ? সামরিক অভ্যুত্থান ইসলামী বিপ্লবের সাথে সংগতিবিহীন এবং ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃতি বিরোধী। সুতরাং ইসলামী আন্দোলন বিপ্লবের এ প্রক্রিয়াকে যুক্তিসংগত কারণেই গ্রহণ করতে পারে না।

ক্ষমতাসীন সরকারে যোগদান

ক্ষমতাসীন সরকার যখন নিজের রাজনৈতিক অবস্থান মজবুত করতে চায় তখন নতুন মিত্রের সন্ধান করে। এ সুযোগে কোন কোন দল বা ব্যক্তি ক্ষমতাসীন সরকারে যোগদান করে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কারো সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত হতে পারে এবং এ

ব্যাপারে দ্বিমতেরও অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু একটি সরকার যথারীতি ক্ষমতায় আছে বা ক্ষমতা দখল করেছে। এমতাবস্থায় সে সরকারে যোগদান করে সরকারটিকে সাহায্য করার মাধ্যমে কিংবা সরকারের সমর্থন নিয়ে ইসলামী বিপ্লবের চিন্তাও কেউ কেউ করতে পারেন।

সুদান ও পাকিস্তানে এই প্রক্রিয়ার একটি পরীক্ষা হয়ে গেছে। পাকিস্তানের পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ ব্যর্থই হয়নি বরং বুমেরাং হয়েছে বলা চলে। আন্দোলনের সুনাম ও সংহতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুদানের পর্যায়টিও শেষ হয়নি। মালয়েশিয়ায় সরকারী দলে যোগদান করে ক্ষমতার সামান্য ভাগ নিয়েছে একটি ইসলামী গ্রুপ। এর পরিণতি হয়েছে অত্যন্ত ভয়ংকর ও বেদনাদায়ক। অবশ্য সেখানকার প্রধান ইসলামী সংগঠন তা করেনি। ক্ষমতাসীন সরকারে যোগদান করে ইসলামী আন্দোলনের যে সেবা করা যায় তার চাইতে অনেক বেশী সেবা সংশ্লিষ্ট সরকারকেই করা হয়ে থাকে। ক্ষমতায় ভাগ বসানোর আপোষকামী নীতি মহান রসূল (সা) এর কর্মধারার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহর নবী এ পন্থা গ্রহণ করেননি। আধুনিক যুগে যে ধরনের শাসনতান্ত্রিক, প্রশাসনিক ও বিচার কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং আমলাতান্ত্রিক প্রভাব অব্যাহত রয়েছে তাতে এ প্রক্রিয়ায় হয়তোবা ক্ষমতার রাজনীতিতে উত্তরণ সহজ হতে পারে। কিন্তু ইসলামী বিপ্লব সফল হবে না। একটি আন্দোলনের বিশ্বাসযোগ্যতা যদি একবার নষ্ট হয় তাহলে তা পুনরুদ্ধার করতে খুবই কষ্ট হয়। ক্ষমতাসীনদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় ভাগ বসিয়ে আর যাই কিছু করা সম্ভব হোক না কেন প্রকৃত কোন ইসলামী বিপ্লব আশা করা যায় না।

নির্বাচন

বুলেট নয় ব্যালটের বিপ্লব সাধন। ব্যাপকভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করতে পারলে নির্বাচনের স্বাভাবিক পথে বিপ্লব আসতে পারে। জনগণের ব্যাপক সমর্থনকে পুঁজি করে নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা অসম্ভব নয়। আন্দোলন গড়ে তোলার সামর্থ থাকলে নির্বাচনে জয়লাভের সামর্থও সৃষ্টি হবে। নির্বাচন এবং আন্দোলন একে অপরের প্রতিবন্ধক নয় বরং সহায়ক।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে নির্বাচনে ভালো করে এক পর্যায়ে গিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা রীতিমত কঠিন। নির্বাচনের প্রচলিত যে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেই ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের জন্য খুব সুবিধা লাভও কঠিন। দারিদ্র্য ও

নিরক্ষরতা পীড়িত দেশে নির্বাচনে সঠিক গণরায় প্রতিফলিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় সঠিক রায় প্রদানের জন্য যতটুকু শিক্ষা থাকা জরুরী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তা নেই। নির্বাচনে অঢেল অর্থের ছড়াছড়ি যা উন্নত দেশগুলোতেও হয়ে থাকে তা চালু থাকা পর্যন্ত সৎ ও ভালো লোক নির্বাচিত হবার কোন সুযোগ সীমিত। অর্থ ব্যয় করার পর স্বাভাবিকভাবে সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করার চিন্তা প্রার্থীর মধ্যে থাকে। তবে এর ব্যতিক্রমও থাকা বিচিত্র নয়।

অস্ত্র ও শক্তি বলে নির্বাচন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করা ইদানিং কালের আরেক নতুন প্রাকটিস। নির্বাচন অস্ত্রধারীদের হাতে জিম্মি হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কেন্দ্র দখল করে প্রতিপক্ষকে বাধা দান, তাছাড়াও ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করা স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সেকালে ভোট যে কারচুপি হতো তা জাল ভোট দেয়া, মৃত ব্যক্তির ভোট দেয়া, একজনে একাধিক ভোট দেয়া ইত্যাদির মধ্যে সীমিত থাকতো। আর আজ সম্পূর্ণ অভিনব ধরনের কর্মকাণ্ড নির্বাচনে চালু হয়েছে। যাকে প্রকাশ্য ডাকাতি ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় নেই। টাকা ব্যয় করে ভোট কিনে ফেলাটাও নির্বাচনে এক ধরনের কারচুপি। কালো টাকার মালিকরা এ প্রাকটিস করে থাকেন। নির্বাচনের উল্লেখিত দিকগুলো একটি ইসলামী আন্দোলন কিভাবে মুকাবিলা করতে পারে তা একটি বড় ধরনের প্রশ্ন। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যা কিছু করতে পারে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে কি তা করা সম্ভব হতে পারে ?

ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকার পুরো সুযোগটা ব্যবহার করে থাকে। প্রশাসন, সরকারী অর্থ, মিডিয়া, যানবাহন ও অন্যান্য উপকরণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে। এটা মুকাবিলা কিভাবে করা সম্ভব ? ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করে তৃতীয় বিশ্বের কেউ ক্ষমতা হারান এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

অনেকে মনে করেন কিছু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে জনগণের মধ্যে ভোটের আমানতদারী সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হলে এবং প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনকে বিপ্লবের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য সন্ত্রাস, অস্ত্র, কালো টাকার ব্যবহার, পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন, মিডিয়া, এনজিও গোষ্ঠীর অনাকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা কিভাবে মুকাবিলা করে জনগণের নির্বিঘ্নে ভোট দানকে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে

সংশ্লিষ্ট দেশের আলেম সমাজের মধ্যে 'ইজমা' বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কেননা এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে সৎ ও ভদ্রলোকদের নির্বাচনে জয়লাভ করে রাষ্ট্রশক্তিতে ভূমিকা পালন সম্ভব হবে না। ভোট ডাকাতি ও সন্ত্রাসের মুকাবিলায় কোন কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে নির্বাচনের অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কি সাফল্য লাভ করা যাবে। সুতরাং বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার সময় এসেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী দলসমূহ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইসলামী দলসমূহের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলামী দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান হতে পারে। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য সরকার গঠনের অপরিহার্যতা যেহেতু সর্বজন স্বীকৃত তাই ইসলামী সরকার গঠনের কৌশলকে কার্যকর করার স্বার্থেই বিষয়টি বিবেচিত হওয়া উচিত। ইসলামী বিপ্লব অর্জন করতে হলে জনগণকে আদর্শিক লড়াইয়ের জন্য তৈরী করতে হবে। তাই নির্বাচনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন এখন সময়ের দাবী।

নির্বাচন ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্বাচন পদ্ধতির উদ্ভব প্রায় দুইশত বছর আগে। আমাদের দেশের জনগণের নির্বাচনের সাথে জড়িত ও পরিচিত হওয়ার ইতিহাস প্রায় একশ বছরের বা তার কম। বৃটিশ শাসন আমল থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এ দেশে দু' দু'টি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে জনগণ।

এদেশে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এবং বিশেষভাবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই বৃটিশ রাজের পতন, দেশ বিভাগ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। আরেকবার ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। ৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক জান্তার গড়িমসি ইয়াহিয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্রের কারণেই অবশেষে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হয়। সুতরাং নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০-এর নির্বাচন এক বিরাট অবদান রেখেছিল। তা ছাড়াও বৃটিশ শাসনকাল থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, জিলা পরিষদের নির্বাচনে দীর্ঘদিন যাবত জনগণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন শ্রমিক

ইউনিয়ন, ছাত্র সংসদ, বণিক সমিতি, কর্মচারী সমিতি, ক্লাব, মসজিদ কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ড থেকে বাজার কমিটি পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মহা সমারোহে। নির্বাচনে আমাদের জনগণ অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তারা বিপুলভাবে। জনগণের নিকট নির্বাচন এখন প্রায় একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে।

বিগত ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত তিনটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠেছেন। তিনটি মোটামুটিভাবে দেশে বিদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি মজবুত হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে এসব নির্বাচন বিরাট ভূমিকা পালন করবে। আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে পরিচিত বৃটেনে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান পর্যায়ে আসতে প্রায় ২০০ বছর সময় লেগেছে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক থেকে অগ্রগামী রয়েছে। এখানে রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল নিরাপত্তার সাথে কর্মসূচী পালন করছে। এমনকি হরতালের মত কর্মসূচী যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশ পরিত্যাগ করেছে এবং বাংলাদেশেও বিকল্প কর্মসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে ব্যাপক জনমত তৈরী হয়েছে। বিরোধী দল কারণে অকারণে সেই হরতাল কর্মসূচীও পালন করছে। বাংলাদেশে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দেশটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের জনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, উর্বর জমি, বিশাল বাজার সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও উন্নত হোক এটা যারা চায় না তারা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা চাইতে পারে না। এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এগিয়ে যায় সে ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়ে উঠবে এবং সংঘাত ও হানাহানির পরিবর্তে আদর্শ কর্মসূচী ও উন্নয়নের রাজনৈতিক ধারা শক্তিশালী হোক সেটাও ঐ মহল পছন্দ করে না।

বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ কতিপয় বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন বা সজাগ হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

এক. জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আগের তুলনায় সজাগ।

দুই. রাজনীতি সচেতন জনগোষ্ঠী এ ব্যাপারে একমত পোষণ করে যে, আমাদের দেশের রাজনীতি বহুদলীয় ধাচের হবে। জনগণ একদলীয় ব্যবস্থা ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তিন. দেশ চালানোর দায়িত্ব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই পালন করবেন। অর্থাৎ নির্বাচনই হবে ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

মোটামুটিভাবে আমাদের দেশের জনগণ একটি সংগ্রাম ও সংঘাতের রাজনীতির মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়ে এসেছে।

সুতরাং নির্বাচন আমাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারের সাথে মিশে আছে। নির্বাচনের এ রাজনৈতিক কালচার বিভিন্নভাবে আমাদের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। নির্বাচন শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর বহু দেশেই রাজনীতির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িয়ে আছে। অনেক দেশেই নির্বাচনকে বাদ দিয়ে রাজনীতির কথা কল্পনা করা যায় না। আবার যেখানে নির্বাচন নেই সেখানে রাজনীতির অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন আছে। সত্যিকার অর্থে রাজনীতি সেখানে নেই, জনগণের রাজনীতি নেই এবং রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সেখানে নেই।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। বৃটিশ যে রাজনীতি রেখে গিয়েছিল মূলতঃ আমরা সেই রাজনীতির উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম। তাই বৃটিশের রেখে যাওয়া নির্বাচন পদ্ধতিও আমরা নির্বিচারে অনুসরণ করে আসছি। প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট যিনি পাবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন তার প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা যাই হোক না কেন ? এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলোতে এবং সাবেক বৃটিশ কলোনিগুলোতে অনুসৃত হয়ে থাকে। বৃটেন বাদে বাকী ইউরোপীয় দেশগুলোতে এবং কিছু আমেরিকান দেশ, জাপান, সুইজারল্যাণ্ডে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভোট পদ্ধতি চালু আছে।

পৃথিবীতে সংখ্যার দিক থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আনুপাতিক হারে নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে বেশীর ভাগ দেশ। অবশ্য দুটো পদ্ধতিরই কমবেশী সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতির নির্বাচন অনুসরণ করেও অনেক দেশ মোটামুটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভারত ও পাকিস্তান একই সাথে স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও ভারত গণতান্ত্রিক একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ নিয়মিতভাবে

নির্বাচনে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করার সময় পায়নি বলে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে উঠেনি। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে কোন ব্যবস্থার পিছনেই নেতৃত্বের ভূমিকা, দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতা একটি বড় কার্যকর উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে।

অতীতে নগর রাষ্ট্রগুলোর পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ভোট পদ্ধতিতে জনতার রায়ে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হতেন কিংবা ইসলামে খেলাফতে রাশেদার সময় জনগণের প্রত্যক্ষ রায়ে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। জনগণ খলিফা বা রাষ্ট্র প্রধানের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতেন। বর্তমানের কোন ভোট দান পদ্ধতি সেটা ছিল না। তবে এর মাধ্যমে খলিফাদের প্রতি জনগণের সমর্থনই জ্ঞাপন করা হতো। অর্থাৎ তারা জনগণ কর্তৃক সমর্থিত ছিলেন বা তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনার পিছনে জনগণের মঞ্জুরী বা অনুমোদন ছিলো। সুতরাং তারা জনসমর্থন সাপেক্ষেই রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করতেন অর্থাৎ ইসলামী ব্যবস্থায় জনগণের রায় বা মতামতকে এখন ভোট বলে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে আখ্যায়িত করা হয় তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্যভাবে স্বীকার করা হয়েছে। ইসলামের খলিফাগণ জনগণের মতামত ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বের মত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করেননি বা নিজেরা স্বঘোষিত রাষ্ট্রনায়ক সেজে বসেননি। আর একথা তো ইতিহাস স্বীকৃত যে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সময় যখন ইসলামের এ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে যাচ্ছিলো তখন হযরত হোসাইন (রা) সেই স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কারবালার প্রান্তরে জেহাদে অবতীর্ণ হন। এজিদ ইসলামের খেলাফতি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করেছিল বলেই হোসাইন (রা) স্বপরিবারে এ মর্মান্তিক জেহাদে শাহাদাত বরণ করেন। অতএব জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলাম উৎসাহিত করে না। পক্ষান্তরে জনগণের অংশগ্রহণকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

বৃটিশের উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশে যে নির্বাচন ব্যবস্থা আমরা পেয়েছি সেই নির্বাচন ব্যবস্থা হুবহু চালু রেখে তা থেকে ফায়দা হাসিল করা কঠিন। যেহেতু নির্বাচন একটি স্বীকৃত সর্বোত্তম ক্ষমতা হস্তান্তর ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা সেহেতু কিছু সংস্কার ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে একটি কার্যকর ব্যবস্থায় রূপান্তর করা যেতে পারে। ইসলাম যে ধরনের সমাজ ব্যবস্থা চায় সেই সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে ব্যাপক জনমত সংগঠিত করে নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লব এখানে সম্পন্ন হতে পারে একথা অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। একটি ব্যবস্থার পক্ষে যদি

জনমত থাকে, জন সমর্থন থাকে তাহলে স্বাধীনভাবে জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ দিলে জনগণ দ্বিধাহীন চিত্তে সে ব্যবস্থার প্রতিই তাদের রায় ঘোষণা করবে।

অনেকে মনে করেন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই মুখ্য বিষয়। নির্বাচন ব্যবস্থাকে যদি নিশ্চিতভাবে পক্ষপাতহীন করা যায় তাহলেই লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের শর্ত

এক. যারা ক্ষমতায় থাকবেন তারা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তাহলে নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা কঠিন। নির্বাচনের তিন মাস বা ছয় মাস একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনা করতে পারে। ক্ষমতাসীনরা কমপক্ষে তিন মাস আগে পদত্যাগ করবেন।

দুই. নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে এবং কমিশনের বর্তমান সুযোগ সুবিধা ও পরিধি বৃদ্ধি করে আইন প্রণয়ন, যে কোন মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিশনকে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

তিন. সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। ভোটারদের বয়স, নাম, ঠিকানা ও সনাক্তকরণ চিহ্নসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ভোটার তালিকায় থাকতে পারে। ভোটারদের পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে অনেক দেশেই চালু করা হয়েছে।

চার. ভোট দানের সময় অনপনেয় কালি ব্যবহার করতে হবে যাতে একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার ভোটদানে আসতে না পারে। জাল ভোট দাতার শাস্তি কঠোর করতে হবে যাতে শাস্তির ভয়ে কেউ জাল ভোট দিতে না আসে।

পাঁচ. ভোট গণনার সময় প্রত্যেক প্রার্থীর প্রতিনিধি হাজির থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং গণনা শেষে প্রিসাইডিং অফিসারের পাশাপাশি তাদেরও স্বাক্ষর থাকতে হবে। প্রতি কেন্দ্রেই ভোট শেষ হওয়ার পর ভোট গণনা করে মাইক যোগে ফলাফল জানিয়ে দিতে হবে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভোটের বাক্স, ফলাফল শিট রিটার্নিং অফিসারের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। টেলিফোনে ফলাফল জানানো হলে তা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতেই জানাতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীর নিকট ফলাফলের শিটের কপি ফলাফল ঘোষণার সময়ই পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কোন প্রিসাইডিং বা সংশ্লিষ্ট কোন

অফিসারের দুর্নীতি বা অনিয়ম প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছয়. প্রার্থী ফরম পূরণের সময়ই দুর্নীতি, বলপ্রয়োগ বা কোন ধরনের অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করবে না মর্মে লিখিত অংগীকার নিতে হবে। এ অংগীকার ভংগ করা হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সাত. প্রার্থীর পক্ষ থেকে কোন ধরনের সভা সমাবেশ আয়োজন বা দান-অনুদান প্রদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থী কোন ধরনের অর্থ ব্যয় করতে পারবে না। একই মঞ্চে পরিচিতি সভার আয়োজন নির্বাচন কমিশন বা সরকার ব্যবস্থা নিবে। একই পোষ্টার বা প্রচার পত্রে সকল প্রার্থীর নাম প্রচারিত হবে। নির্বাচনের ৩ মাস কোন প্রার্থী নিজের জন্য ভোট চাইতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিযান হতে পারবে না। ভোটের নামে যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের বিলাসিতা করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। নির্বাচন বা ভোটদান যে প্রার্থীর স্বার্থে নয় একথাটা ভালভাবে জনগণকে বুঝাতে হবে। নির্বাচনের সময় প্রার্থী অঢেল অর্থ ব্যয় করছে। যার ফলে নির্বাচিত হবার পর সেই অর্থ উদ্ধারের জন্য রাষ্ট্র ও জনগণের অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা তাকে করতে হচ্ছে।

আট. প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে বি ডি আর, পুলিশ ও আনসারের সহযোগিতায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মাস্তান দমনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সহযোগিতাও নেয়া যেতে পারে। তাছাড়াও দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে পরপর কয়েকদিন নির্বাচন সম্পন্ন করার কথাও চিন্তা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফলাফল এক সাথে ঘোষণার ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ ভোট গ্রহণের শেষ দিন ফলাফল ঘোষণা করা যেতে পারে।

নয়. গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতির পরিবর্তে আনুপাতিক ভোট পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে নির্বাচন আরও সুষ্ঠু এবং অবাধ হবে। আনুপাতিক ভোট পদ্ধতিই অধিকতর গণতন্ত্র সম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। গরিষ্ঠ পদ্ধতিতে কম ভোট পেয়ে এমনকি কোন ক্ষেত্রে জামানত বাজেয়াপ্ত একজন প্রার্থীও নির্বাচিত ঘোষিত হতে পারে। অধিকাংশ ভোটারের সমর্থন যাদের পিছনে নেই তারাই জন প্রতিনিধি হয়ে যেতে পারেন গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতিতে। কিন্তু আনুপাতিক পদ্ধতিতে এ সুযোগ নেই। নিম্নতম ভোট সংখ্যা নির্ধারিত করে দিলে দলের সংখ্যাও কমে আসবে এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের নামে পরবর্তী সময়ে সুযোগ বুঝে ক্ষমতাসীন কিংবা কোন বড় দলে যোগদানের সুযোগও থাকবে না। অনেক প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হয়ে পরে সরকারী সুযোগ সুবিধা

গ্রহণের জন্য অনৈতিকভাবে সরকারী দলে যোগদান করে থাকে। জাতীয় নির্বাচন যেহেতু সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন সেহেতু স্বতন্ত্র প্রার্থীর এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা অর্থহীন।

দশ. বেসরকারীভাবে একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষক দল অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক হতে পারে। অবাধ ও পক্ষপাত মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেসব শর্তের আলোচনা করা হয়েছে তা নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান বিষয়বস্তু হওয়া উচিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা। নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত হলে যাদের প্রতি জনগণের আস্থা প্রকাশ পাবে অর্থাৎ যারা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ম্যাণ্ডেট পাবেন তাদেরকেই এ দায়িত্ব দিতে হবে। ক্ষমতা পরিবর্তনের এ প্রক্রিয়া মেনে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে তা অনুশীলন করলে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে পারে। দেশের রাজনীতিতে একটি পদ্ধতি অনুসরণের প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে এবং রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরে আসাও সহজ হতে পারে। এমন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির সুযোগ পেলে ইসলামী আদর্শকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমেই ইসলামের রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন সম্ভব হতে পারে। ভোটের প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে যারা বিশ্বাস করেন তারা মুদ্রার একটি পিঠই দেখতে অভ্যস্ত, ভিন্ন পিঠ দেখতে নারাজ। গণতন্ত্রের মত ব্যবস্থা নির্বাচনের জোড়াতালি দিয়ে টিকে আছে আর ইসলামের মত নির্ভুল ব্যবস্থা কেন নির্বাচন প্রক্রিয়ার মত একটি উত্তম ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে পারবে না তার কোন যুক্তি নেই। ইসলাম যে ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করবে তা মূলতঃ মানুষের মনন ও দৃষ্টিভংগিকেই পাল্টে দিবে। এক ধরনের হতাশায় আক্রান্ত হয়ে আজ অনেকে নির্বাচনের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াতে ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নির্বাচন ব্যবস্থায় ক্রটি বিচ্যুতি হ্রাস করে তাদের সে হতাশা দূর করা সম্ভব হতে পারে। শক্ত হাতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যারা বিশ্বাসী তারা কেন শক্ত হাতে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে আস্থা রাখতে পারেন না এর কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ আর কোন পন্থায় নিশ্চিত করা যেতে পারে ? জনগণের সমর্থন ও অনুমোদন ছাড়া কি কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে কিংবা স্থিতিশীলতা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে ?

গণআন্দোলন

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়েই ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম। এজন্য ব্যাপক গণআন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। ইসলাম কায়েমের স্বার্থে গণজাগরণ দরকার। জনগণের মধ্যে আত্মত্যাগ, কোরবানী ও আদর্শের জন্য প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেয়ার মত ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা না থাকলে কোন আন্দোলনেই গতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারে না। অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত করে শোষণ জুলুমের অবসান করা, দুনিয়ার মানুষের কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জন্য প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। ক্ষমতায় উত্তরণের অন্যান্য প্রক্রিয়ায় যে সমস্যা আছে গণআন্দোলনে তা নেই। গণআন্দোলনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা হতে পারে। সুতরাং গণআন্দোলনের ও নির্বাচনের সমন্বয়েই কাঙ্ক্ষিত একটি পরিবর্তন আসতে পারে। গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিতে পারে। তবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচনের আয়োজন করে সঠিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। চূড়ান্তভাবে যেমন নির্বাচনকেই একমাত্র পন্থা বলে ধরে নেয়া ঠিক হবে না তেমনি কেবলমাত্র গণআন্দোলনকেই বিপ্লবের একমাত্র পন্থা বলে গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। ইসলামী বিপ্লবের জন্য এদুটো প্রক্রিয়াই উন্মুক্ত থাকতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে অথবা যে কোন একটি প্রয়োগ করে সামনে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

সফল গণআন্দোলন বা গণঅভ্যুত্থান-এর মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব বা রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন করা যে সম্ভব ইতিহাসে তার একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। গণআন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে ইরানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার মত। রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইরানী জনগণ যে বিপ্লব সাধন করেছে আধুনিক ইতিহাসে তা এক যুগান্তকারী ঘটনা বলেই চিহ্নিত হতে পারে। তাদের সাথে কারও মতপার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে ইরানী জনগণ সম্পূর্ণভাবে এক নতুন কাঠামোর শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুন্নী জগতের সাথে বিস্তর মতপার্থক্য সত্ত্বেও এ বাস্তবতা কারো পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তারা দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী এক নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছে। জনগণের ব্যাপক সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং রক্তদানের মধ্য দিয়েই

ইরানে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ঘটনার বিচারে এবং তাৎপর্যের দিক থেকে ইরানী বিপ্লব সম্ভবতঃ বিগত অর্ধশতাব্দীর এক স্মরণীয় ঘটনা। একটি দেশের অসহায় নিরস্ত্র জনগণের শক্তির সামনে শেষ পর্যন্ত পরাক্রমশালী শাসক গোষ্ঠীর কামান বন্দুক ও গোলা বারুদ টিকতে পারেনি। জনতার বিক্ষুব্ধ স্রোতের সাথে এক পর্যায়ে সশস্ত্র বাহিনীও একাত্মতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। বহির্বিশ্ব বিপ্লব সংঘঠিত হবার কিছু আগেও কল্পনা করতে পারেনি যে, ইরানে অতবড় এক গণঅভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে। এমনকি অঘটন ঘটন পটিয়সি শক্তিধর সি আই এ কিংবা কে জি বি-র পক্ষেও অনুমান করা কঠিন ছিল যে, ইরানে কি হতে যাচ্ছে। বিদ্রোহী জনতাকে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সহায়তায় শেষ পর্যন্ত ইরানের শাহ দমন করতে সক্ষম হবে বলে সি আই এ-এর পক্ষ থেকে আশাবাদ পোষণ করা হয়েছিল। আমাদের উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই স্বাধীনতা সংগ্রামসমূহ গণআন্দোলন তথা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। গণ-আন্দোলনগুলোর পরিণতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত না হলে পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে যেমন জড়িয়ে আছে গণআন্দোলন তেমনি অনেক দেশের রাজনৈতিক উত্থান পতনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে গণআন্দোলন। সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই শুধু নয় বরং সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক কিংবা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইতিহাসের বিশিষ্ট দিক হচ্ছে গণআন্দোলন। তাই আজও এই প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে। গণআন্দোলন ক্ষেত্র বিশেষে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করার কারণে অনেকে গণআন্দোলনের সাথে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের একটি যোগসূত্র আশংকা করেন। সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী, বলিষ্ঠ এবং বিচক্ষণ নেতৃত্ব এবং যথাযথ পরিস্থিতি এ তিনের সংযোগ ঘটলে দুনিয়াতে বড় ধরনের গণঅভ্যুত্থান ঘটা সম্ভব এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব সাধনও সম্ভব বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা যেতে পারে। ভৌগলিকভাবে একটি স্বাধীন দেশের কাঠামোর মধ্যে গণআন্দোলন সৃষ্টি করে বিপ্লবের লক্ষ্য হাসিল করা অসম্ভব নয়। শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন চালিয়ে জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, গণআন্দোলন ও নির্বাচন সম্পূরক হতে পারে অর্থাৎ একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয়। ইসলাম যেহেতু শক্তির জোরে কিংবা বন্দুকের জোরে কোন জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেয়ার কোন প্রক্রিয়া সমর্থন করে না সেহেতু ইসলামী বিপ্লবের জন্য গণআন্দোলন অপরিহার্য।

গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে ঃ

এক ইসলাম মানুষের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কি পরিবর্তন আনতে চায় তা অতি সহজ ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

দুই ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তির অবসান কল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিন ইসলামের মানবতাবাদী বিপ্লবী দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য যোগাযোগের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক মাধ্যম ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।

চার চরিত্র ও কর্মে জীবন্ত ইসলামের নমুনা হিসেবে এক ত্যাগী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে যারা সমাজে স্থান করে নিতে সক্ষম হবেন।

পাঁচ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং জনমত সংগঠনের জন্য ব্যাপকভিত্তিক সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

ছয় দাওয়াত-সংগঠন-সংগ্রাম প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংগ্রাম যুগে আদর্শের প্রতীক লোক গঠন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যে কোন আন্দোলনের সাচ্চা সৈনিক সংগ্রাম যুগেই তৈরী হয়। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই ও কঠিন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই খাঁটি লোক তৈরী হবেন যারা সত্যিকারভাবে বিপ্লব গঠন ও বিপ্লবের সাফল্য ধরে রাখবেন।

সাত বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক জনতাকে জড়িত করার জন্য প্রচণ্ড গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে।

আট প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ সৃষ্টি এবং ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে গণবিচ্ছিন্ন করার জন্য সঠিক রণকৌশল গ্রহণ করতে হবে। গণজাগরণের পাশাপাশি বিকল্প নেতৃত্ব উপস্থাপন করতে হবে জনগণ যাদের উপর আস্থাবান হবেন।

নয় ক্ষমতা দখল ও সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বৃহত্তর জনতাকে সম্পৃক্ত করার কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

দশ জনমত সংগঠনের জন্য একটি আধুনিক রাজনৈতিক দল যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে সেসবের সাথে সাথে আন্দোলন জনগণের মধ্যে

কতটা সাড়া উৎপন্ন করছে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে জনমত জরীপ করে অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

এগার. বাস্তব জীবনের সমস্যাদির সমাধানের পাশাপাশি মানব জাতিকে আখেরাতের ভয়াবহ পরিণতি এবং চিরন্তন পুরস্কারের দিকে ধাবিত করতে হবে। আল্লাহর দাসত্ব, নবী (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যেই যেন মানব জাতি শান্তি, স্বস্তি, প্রশান্তি ও সমৃদ্ধির সন্ধান পায়।

□

০১। ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-২২

০২। অনাগত মানব সভ্যতা ও ইসলাম
সাইয়েদ কুতুব শহীদ, পৃষ্ঠা-৭২-৭৪

০৩। ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

০৪-১৪ পর্যন্ত ঐ

১৫। Mile stone
সাইয়েদ কুতুব শহীদ

১৬। ঐ

১৭। ঐ